বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৫১

দাম : এক টাকা চার আনা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর : ননীগোপাল পোদ্দার, ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

চার পা থেকে দু'পা হবার কথাটি কিছু নতুন নয়।

বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইনের নামের সঙ্গেই কথাটি জড়িত: ডারউইনের 'ক্রমবিকাশ তত্ত্ব' (থিওরি অফ ইভল্যুশন)। এক সময়ে মানুষ ব'লে কোন প্রাণী ছিল না এ দুনিয়ায়। নিম্নতর প্রাণীর ক্রমবিকাশের ধারার মাঝে সৃষ্টি হয় মানুষ। সেই ক্রমবিকাশের ধারায় যে শেষতম ধাপ—এক বিশেষ জাতের বনমানুষ থেকে মানুষ গড়ে উঠবার ধাপ—তাইই এখানে উপস্থিত করা হয়েছে।

কম্যুনিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্ক্স-এর সহকর্মী বিজ্ঞানী এঙ্গেল্স বলেছিলেন, তিনটি বিরাট আবিষ্কারের ভিত্তিতে মানুষের জ্ঞান দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলতে পারল। প্রথমটি হল—কোষ (বা সেল)-এর আবিষ্কার। শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে জ্ঞান হল দ্বিতীয়টি। এবং তৃতীয়টি হল, "ডারউইন-যে সেই প্রথম সুসমঞ্জস রূপে প্রমাণ করলেন যে, আজ আমাদের চারিধারে ঘিরে রয়েছে প্রকৃতির যে-সব জৈব উৎপাদনের ভাণ্ডার—মানবজাতি সহ—সে-সবই হল কয়েকটি আদি এক-কোষ জীবাণুর ক্রমবিকাশের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল; এবং এই এক-কোষ জীবাণুগুলিও আবার প্রোটাপ্লাজ্ম বা অ্যালব্যুমেন থেকে উৎপন্ন হয়; সেই প্রোটোপ্লাজ্ম বা অ্যালব্যুমেন সৃষ্টি হয়েছিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।"

সে দীর্ঘ প্রক্রিয়া এই লেখার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। শেষ পরিচ্ছেদে সে-সম্পর্কে সর্বাধুনিক আবিষ্কারের বিবরণী উপস্থিত করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে,—তার শেষতম ধাপ নিয়েই এই চার পা থেকে দু'পা হবার কাহিনী।

এই কাহিনীর সার কথাটি তুলে ধরা যায় এঙ্গেল্‌স্-এরই ভাষায়ঃ "জন্তু-জানোয়ারেরা বহিঃপ্রকৃতিকে **ব্যবহার করে** মাত্র, এবং নিজেদের নিছক উপস্থিতি দিয়েই বহিঃপ্রকৃতিতে পরিবর্তন আনেঃ মানুষ যে-পরিবর্তন ঘটায়, তার ফলে বহিঃপ্রকৃতিকে দিয়ে নিজের লক্ষ্যসাধনে কাজ করিয়ে নেয়; মানুষ বহিঃপ্রকৃতির উপর **প্রভুত্ব** বিস্তার করে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এই হল চূড়ান্ত, মূল পার্থক্য; এবং এখানেও শ্রমই ঘটায় সে-পার্থক্য।"

সেই বিশেষ জাতের বনমানুষ থেকে মানুষে রূপান্তরের কাজে শ্রম-যে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেই কথাটিই এই চার পা থেকে দু'পা হবার কাহিনীতে বলা হয়েছে। মানুষ একেবারে আক্ষরিক অর্থে নিজ-হাতে নিজের দেহ-মনটিকে গড়ে তুলেছে, বিকশিত করে তুলেছে। কিন্তু, ভাববাদী দার্শনিক মতবাদে আচ্ছন্ন বিজ্ঞানীরা সেই মূল সত্যটি দেখতে পান না। এঙ্গেল্‌সই বলেছেন, এই ভাববাদী দার্শনিক মতবাদ "তাঁদের মনকে এমনভাবে শাসন করে যে, ডারউইন-মতবাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরাও মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারেন নাঃ কারণ ঐসব আদর্শের প্রভাবে তাঁরা শ্রমের ভূমিকাটি দেখতে পান না।"

'ডায়ালেক্‌টিক্‌স অফ নেচার' নামে বইয়ে 'দি পার্ট প্লেড্ বাই লেবর ইন্ দি ট্রানসিশন ফ্রম এপ্ টু ম্যান' নামে পরিচ্ছেদে এঙ্গেল্‌স যে-তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থিত করেছেন, তাই অনুসরণ করে এই 'চার পা থেকে দু'পা' লেখা হয়েছে।

লুই হেন্‌রি মর্গ্যান এবং আরও কোন কোন আধুনিক বস্তুবাদী বিজ্ঞানীর তথ্যাদিও সংযোজিত হয়েছে।

ইস্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী ভাষা ও রূপে বিষয়টি উপস্থিত করবার চেষ্টা হয়েছে। তবে, বয়স্কদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে শ্রমের এই ভূমিকার কোন পরিচয় নেই, তাঁদের কাছে এই লেখাটির ভাষা একটু বেশি সহজ মনে হলেও, বিষয়বস্তুতে তাঁরাও প্রয়োজনীয় বুঝে আগ্রহান্বিত হবেন বলে আশা করা যায়।

'চার পা থেকে দু'পা' হবার এই কাহিনীটির শেষ বাক্যটি হল: "শ্রম আর মনের ফসলে সমৃদ্ধ মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে নতুন নতুন বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে।" সেই অগ্রগতির পথে সোবিয়েৎ দেশের মানুষ জীববিজ্ঞানে এক নতুন বিপ্লব ঘটিয়েছে। বংশগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এবং এই প্রথম প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সোবিয়েৎ দেশে দৈনন্দিন কার্যাবলীর মাঝে যা পরীক্ষিত হয়ে এসেছে, তার সুসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগত ভিত্তিটিও এই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীদের "অজয়-অমর বংশগত পদার্থ", আর "অপরিবর্তনীয় বংশগতির" অপবিজ্ঞানের ওপর মারণ আঘাত পড়েছে। বর্তমানে সোবিয়েৎ মিচুরিন জীববিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ত্রফিম দেনিসোভিচ লাইসেঙ্কোর 'জীববিজ্ঞানের পরিস্থিতি' (দি সিটুয়েশন ইন দি সায়ান্স অফ বায়লজি) থেকে তথ্যাদি নিয়ে লিখিত শেষ পরিচ্ছেদটিতে সেই বিষয়টি উপস্থিত করা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে কোষ-বিজ্ঞানেও ভিরচাওপন্থী মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা যে "অসম্ভববাদের" বেড়া তুলে রেখেছিল, তাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে সোবিয়েৎ দেশে ওল্‌গা বোরিসভ্‌না লেপেশিন্‌স্কাইয়ার নতুন আবিষ্কারে। প্রাণের উৎপত্তিটিকে মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদী অপবিজ্ঞান এতদিন যে-"রহস্যে" আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, তাও ঘুচে গেছে। জীববিজ্ঞানে এই বিরাট দুটি সাম্প্রতিক অগ্রগতি মূল রচনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সুসমঞ্জসই হবে বিবেচনা ক'রে শেষে যোগ করা হল।

উল্লেখ করা দরকার যে, এই নতুন বিষয়টি বেশ কঠিন। এই স্বল্প পরিসরে তার আলোচনা করা আরও কঠিন। তাই, তাকে উপস্থিত করবার ভাষা ও রীতি খুব-সহজ করা, এমনকি মূল রচনার সমতুল্য সহজ করাও, অন্ততঃ এই লেখকের পক্ষে দুঃসাধ্য! সে কথা এইখানেই ব'লে রাখা হল।

সারা গায়ে লম্বা লম্বা লোম। কানের শেষের দিকটা ছুঁচলো। লম্বা চোয়ালটা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। মাথাটাও ঝুঁকে পড়েছে

সামনের দিকে। যতখানি পারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও বেশ খানিকটা কুঁজো। হাঁটু দুটো সামনের দিকে বাঁকা। এর বেশি সোজা হতে পারেই না। এমনই দেহের গড়ন।

সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখানো হল বটে। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ানো তার স্বভাব নয়। আসলে সে চার হাত-পায়ে ভর করেই চলে। তা ছাড়া, মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছে এই প্রথম। জঙ্গলের গাছে-গাছেই চলাফেরা করে, গাছেই তার বাসা। দলবদ্ধ হয়ে তারা গাছে বাস করে।

এবার বোঝা যাচ্ছে, কে এ। আমরা দেখব বলে এদেরই মত কাউকে ধরে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছে। কিন্তু ওই-যে তাদেরই একজন এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কিন্তু আজকের কথা নয়। জায়গাটাও কোন চিড়িয়াখানা নয়।

এ হল লাখ লাখ বছর আগের কালের কথা। আর, জায়গাটা হয়ত মধ্য এশিয়ার কোন এক আদিম জঙ্গলের ধারে। কত লাখ বছর, তা আজও

পাকাপাকি ঠিক করা যায়নি। কিন্তু লাখ লাখ বছর! ভাবাই যায় না, সে কত!

আজ থেকে সে কতকাল আগে, একটু বুঝবার চেষ্টা করা যাক। আমাদের এ যুগ হল উন্নত বিজ্ঞানের যুগ। অ্যাটমের যুগ আসছে। অ্যাটম ভেঙে শক্তি বের করবার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগাবার জন্যে। আর, এই অ্যাটম-ভাঙা প্রক্রিয়াতেই শক্তি সংগ্রহ করে সূর্য। মানুষের দুনিয়ায় সে বিরাট শক্তি অবিশ্যি এখনও আমেরিকার বোমায় বন্দী হয়ে আছে। একমাত্র সোবিয়েৎ দেশেই সে-শক্তিকে বোমায় না পুরে কল-কারখানার কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে। মানুষ যেন সূর্যের সমকক্ষ হতে চলল!

এমনি করেই মানুষ মানুষ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির একেকটি শক্তি জয় করে মানুষ বড় হয়ে উঠেছে। আজ-তো তারে তারে বিদ্যুৎ ছুটেছে। হাজার হাজার মাইল দূরের মানুষের কাছে কথা ছুটেছে বেতারে। মানুষ ছুটেছে আকাশপথে, সাত-সমুদ্র-তের-নদীর বুকে, জলের তলা দিয়েও। আবার মাটিতে মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি তো আছেই। কল-কারখানা চলেছে মহাবেগে। কত কাজ-তো যন্ত্রে একরকম আপনাথেকেই চলে—মানুষের হাত লাগে সামান্যই। আর, এরই সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে মানুষের বিজ্ঞান, নতুন সমাজ, নতুন নতুন ধারণা বিশ্বাস—স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কম্যুনিজম।

আর, বিদ্যুতের অমন সব যাদুকরী ক্ষমতা হয়েছে-তো মাত্র সত্তর-পঁচাত্তর বছরের ভেতর। এবং, এই সবকিছুর মূলে যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, তার প্রথম আবিষ্কারও-তো মাত্র শ' তিনেক বছর আগেকার কথা। ১৬৩০ সালে অত্যন্ত আনাড়ী একটি পাম্প তৈরি হয়েছিল—কয়লাখনি থেকে জল তুলবার জন্যে। কিন্তু ভাল মতো কাজের পাম্প তৈরি হয় আরও অনেক পরে—১৭৬৯ থেকে ১৭৮৪ সালে। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ সে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাল।

কয়লার ভেতর সূর্যের যে-শক্তি বন্দী হয়ে ছিল, মানুষ তাকে মুক্ত করে তাপ সৃষ্টি করল,—যান্ত্রিক শক্তি তৈরি হল।

এর আগে পর্যন্ত জল-হাওয়ার শক্তিই ছিল মানুষের সহায়। তাই দিয়ে কল চলত, জাহাজ সাগর পাড়ি দিত। তারও আগে, হাজার খানেক বছর আগে, এই জল-হাওয়ার শক্তিকে কাজে লাগাবার কৌশলটিও মানুষের জানা ছিল না। পশুর আর মানুষের পেশীর শক্তিই ছিল একমাত্র সহায়। আজ যেমন অ্যাটমকে মানুষের অনুগত দাস হিসেবে ব্যবহার করবার চেষ্টা হচ্ছে, বিদ্যুৎ-তো ঘরে-ঘরে বিশ্বাসী ভৃত্য; তখন তেমনি মানুষ মানুষকে দাস হিসেবে ব্যবহার করত। তাই দাসপ্রথা। অবিশ্যি এখনও মানুষ মানুষকে দাস হিসেবে ব্যবহার করে। তবে, কৌশলটা একটু আলাদা।

এমনি করে পেছনে চলতে থাকি।

পাঁচ হাজার বছর আগে প্রথম অক্ষর আবিষ্কার হয়, মানুষ লিখতে শুরু করে। বলা হয়, সেইখান থেকেই সভ্যতার আরম্ভ হল।

আরও নামতে থাকি। এবার সভ্যতার নামগন্ধও আর নেই। বর্বর সমাজ। প্রায় তিন হাজার বছর ধ'রে মানুষ বর্বর জীবন যাপন করেছে। তারই ভেতর সে ধাপে ধাপে সভ্যতার দিকে এগিয়েছে। খনিজ লোহা গলিয়ে লোহার হাতিয়ার তৈরি করাটাই তার শেষ ধাপ। তার আগে, এশিয়াখণ্ডে প্রথম গৃহপালিত পশুর চিহ্ন দেখা যায়। সেচের সাহায্যে মানুষ চাষ-আবাদ করতে শেখে। আরও আগে দেখা যায় মৃৎশিল্প—মাটির বাসনকোসন তৈরি করতে শেখে মানুষ। এ হল প্রায় সাড়ে সাত হাজার বছর আগেকার কথা।

এমনি ক'রে অতীতের পথে চলতে থাকা যাক। বর্বর সমাজের মানুষের জীবনে যা ছিল, সে-সুখ-সুবিধাগুলিও মিলিয়ে যাচ্ছে। সে হলো মানুষের আদিম বন্য অবস্থা। সেই সময়েই মানুষ তীর-ধনুক তৈরি করতে শিখেছে, শিকার করে খেতে শিখেছে। আরও পেছিয়ে দেখা যায়, তীর-ধনুকও নেই।

তবে, মাছ ধ'রে খেতে শিখেছে মানুষ সেই সময়। সেই সময়েই মানুষ আগুন জ্বালতে শেখে। তার আগে আগুন জ্বলত শুধু প্রকৃতির খেয়ালে।···

তারও আগে?

তারও আগে উলঙ্গ অসহায় মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ছুটোছুটি করেছে। শীতে কষ্ট পেয়েছে, মরেছে। গুহায় আশ্রয় নিতে গিয়ে বাঘ-সিংহের পেটে চলে গেছে। ফল-মূল না পেয়ে পোকা-মাকড়ের সন্ধানে ঘুরেছে। মানুষ মানুষ খেয়েছে। মৃত পশুর মাংসের ভাগ নিয়ে পশুর সঙ্গে কাড়াকাড়ি করেছে। গত দুর্ভিক্ষে ধনীর খাবারের টুকরোর জন্যে কলকাতার ডাস্টবিনে মানুষ আর কুকুরের কাড়াকাড়ির মতো! এমনি করে-যে কত হাজার হাজার বছর কেটেছে তার আর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই!

সে হল মানুষের শৈশব। আমার-তোমার পিতৃপুরুষের হাজার হাজার পুরুষ আগে সে হল মানুষজাতির শৈশব। ···

··· তারও আগে কী? অতীতের গহ্বর খুঁড়তে গিয়ে আর বিশেষ কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, মানুষ নেই—মানুষ ব'লে কোন প্রাণী ছিল না এ দুনিয়ায়।

তবে, লক্ষ লক্ষ বছর আগে গিয়ে সেই লোমশ মনুষ্যাকৃতি জীবের সন্ধান পাওয়া যায়।* সেই যে সুরুতেই যার কথা বলা হয়েছে। সারা গায়ে লোম—বাঁকা হাঁটু, লম্বা চোয়াল, কুব্জ দেহ, আধা-বৃক্ষাশ্রয়ী জীব। চার্লস ডারউইন নামে বিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন, তারাই আমাদের পূর্বপুরুষ। তাতে আমার-তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমার-তোমার বাপ-পিতামহের হাজার হাজার পুরুষ আগে, গোটা মনুষ্যজাতিরই পূর্বপুরুষ হল সেই লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার আনাড়ী জীবটি।

হাত আবিষ্কার হল

লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার এই আনাড়ী জীবটি হল বনমানুষ। লক্ষ লক্ষ বছর আগে! আগেই বলা হয়েছে, সে-যে কবে, তা এখনও পাকাপাকি ঠিক হয়নি। তবে, ভূবিদ্যার পণ্ডিতরা কিছু আন্দাজ করেছেন। পৃথিবীর বুকে নদী, পর্বত, সরোবর, ইত্যাদি কী করে সৃষ্টি হল? পৃথিবীর গর্ভে যুগে যুগে যে ভাঙা-গড়া চলেছে তার কারণ কী? এইসব ভাঙা-গড়ার ভবিষ্যতই-বা কী? এইসব বিষয় নিয়ে যে বিজ্ঞান, তারই নাম ভূবিদ্যা। সেই ভূবিদ্যার পণ্ডিতরা বলেন, বোধহয় তৃতীয়কালের শেষের দিকেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

অনেকটা মানুষের মতো দেখতে একরকম বনমানুষ তখন বাস করত। তবে, তারা ছিল বনমানুষদের ভেতর কুলীন, বনমানুষদের ভেতর একটু উঁচু ধরনের প্রাণী। তাদের মূল বাসস্থান ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলের কোথাও। এমনও অনুমান করা হত যে, সে-দেশ ভারত মহাসাগরে তলিয়ে গেছে। কিন্তু, সম্ভবতঃ তা ঠিক নয়। কারণ, ভারত মহাসাগরে যে-শৈলশিরা আছে, তা যদি অতীতের কোন মহাদেশের চিহ্নও হয়—সে মহাদেশ নিশ্চয়ই ওই উঁচু দরের বনমানুষদের আগেই তলিয়ে গিয়েছিল। সে যা-ই হোক-না-কেন, গ্রীষ্মমণ্ডলেরই কোন এক জায়গায় তারা বাস করত। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

সেই-যে আমাদের গেছো পূর্বপুরুষ, তারা ক্রমে গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিল—খাবারের সন্ধানে।

ডালে ডালে বেড়াতে, গাছে চড়তে, গাছ থেকে নামতে, হাত আর

পায়ের কাজ আলাদা। তারই ফলে, পায়ের থেকে হাতের কাজ করবার কায়দায় পার্থক্য হয়েছিল। তাই, মাটিতে নেমে এসে তারা আর চার হাত-পায়ে চলল না। ক্রমেই সোজা হয়ে দু' পায়ে হাঁটতে লাগল। কিন্তু, একেবারে আজকের মানুষের মতো নয়। আগেই বলেছি, তাদের হাঁটু দুটো ছিল সামনের দিকে বাঁকা, মাথাটা ঝুঁকে পড়ত সামনের দিকে। কিন্তু, সেই-যে তারা দু' পায়ে যথাসম্ভব সোজা হয়ে চলতে লাগল, সে হল এক বিরাট ঘটনা। কেননা, তারই ফলে বনমানুষ থেকে মানুষে পরিবর্তনের গোড়া-পত্তন হয়ে গেল।

না হলে আর চলছিল না

কেন? বনমানুষ দু' পায়ে চলতে থাকলেই কি সে আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে যায়? না, তা হয় না। কিন্তু, তারা ছিল এক বিশেষ জাতের বন-মানুষ। তার থেকে পরিবর্তনটা কীভাবে হল, তা একটু পরেই বলা হবে। আগে দেখে নেওয়া যাক, খাবারের সন্ধানে মাটিতে নেমে আসার কারণটা কী।

তাদেরই মতো এক রকমের বনমানুষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এরাও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। চার হাত-পায়ে না চ'লে দু' পায়ে হাঁটতে পারে এরাও। কিন্তু, নেহাত দরকার পড়লে তবে। আর তা-ও কি আমাদের মতো? মোটেই না। তারা হাঁটে অত্যন্ত আনাড়িভাবে। এমনিতে তারা কুঁজো হয়ে চলে; হাতও মাটিতে পড়ে। পা দুটো টানটান ক'রে গোটা দেহটাকে লম্বা বাহুর ভেতর দিয়ে দুলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে। পঙ্গু মানুষের মতো অনেকটা। লম্বা বাহু দুটো যেন দুই বগলের লাঠি।

আজকালকার বনমানুষদের ভেতরও আবার অনেক রকম আছে। কেউ চার হাত-পায়ে চলে, কেউ-বা চলে দু'পায়ে। তবে, মনে রাখতে হবে, এদের দু'পায়ে চলাটা নেহাৎ গোঁজামিলের ব্যাপার। আমাদের মতো-তো নয়ই।

কিন্তু, আমাদের সেই লোমশ পূর্বপুরুষেরা একটু একটু করে বেশ সোজা হয়ে চলতে পারল। তার কারণ কী? কারণ, তা না হলে আর চলছিল না। সেটা কী রকম, তাই বলি।

পণ্ডিতরা বলেছেন। বহু অনুসন্ধান আর গবেষণা করে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। তখনকার দিনে জল-হাওয়ার অবস্থা-তো এখনকার মতো এমন ছয় ঋতুতে ভাগ-করা ছিল না। কিন্তু, এই ঋতুভেদ আর ঋতু-পরিবর্তন মোটামুটি পাকাপাকি হয়েছিল সেই তখনই। ঋতু-বিভাগটা তখন এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যে, বছরের ভেতর কয়েক মাস ধ'রে গাছে ফল ফলত না। আর, ফলই-তো ছিল প্রধান খাবার। কাজেই খাবারের সন্ধানে গাছের ডাল ছাড়তে হল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষ যেমন ভিটে-মাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল; খাবারের সন্ধানে এসে মরেছিল কলকাতার ফুট-পাথে। আমাদের সেই পূর্বপুরুষেরা তেমনি গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু মাটিতে নেমে খাবার খুঁজতে হলে চারিদিকে নজর রাখা চাই।

আরও উঁচু থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকানো দরকার। আরও দূর অবধি নজর ফেলাও চাই—কোথায় কি আছে না-আছে। জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও-তো ছিল। এমনি অবস্থায় দু' পায়ে দাঁড়ালে কিছুটা সুরাহা হতে পারে। চার হাত-পায়ে চলার থেকে-তো অনেকটা উঁচু থেকে অনেক দূর অবধি নজর রাখা যায়।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন আর এক কথা। ঋতুপরিবর্তনের ফলে-তো বছরের ভেতর মাত্র কয়েক মাস ফল পাওয়া যেত না।

কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জঙ্গলকে-জঙ্গলই একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তাই, এ আর ডাল থেকে মাটিতে নামার ব্যাপার নয়। ডালই নেই। বাঁচতে হলে, যেমন করে হোক, মাটিতেই খাবার জুটিয়ে নিতে হবে। কাজেই, সোজা হয়ে চলাফেরা করা ছাড়া কোন গতিই আর ছিল না। এই বাঁচবার প্রয়োজনের তাগিদেই অতবড় পরিবর্তনের গোড়াপত্তন হয়ে গেল।

এইবার দেখা যাক, সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা অত বড় ঘটনা কিসে? আর, পরিবর্তনটিই-বা কী। সে-পরিবর্তন হলই-বা কী করে।

হাতের শৈশব

গাছে যখন বাসা ছিল, তখন চলার কাজেও হাত লাগত। মাটিতে চলতেও অবশ্য প্রথম প্রথম হাতও লাগত। দু' পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ফলে কী হল? চলবার কাজ থেকে হাত ছাড়া পেয়ে গেল।

চলবার কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে হাত কি বেকার হয়ে ঝুলতে লাগল? না, অন্য কাজে লেগে গেল?

গাছে বাস করবার সময়ই-তো বনমানুষদের হাত আর পায়ের কাজ আলাদা ছিল। আগেই বলা হয়েছে, গাছে চলতে, উঠতে, নামতে হাতের কাজ এক রকমের, পায়ের কাজ আলাদা। আবার, ফল-মূল তুলতে, ধরতে লাগে হাত। বিড়াল-কুকুরদের সামনের থাবাটা যেমন। অনেক রকমের বানর আবার গাছে বাসা বাঁধে হাত দিয়ে। শিম্পাঞ্জীরা-তো ঝড়-জল থেকে বাঁচবার জন্যে ডালে-ডালে জুড়ে ছাদ তৈরি করে ফেলে। সেও হাত দিয়ে। শত্রু এলে হাত দিয়ে ডালপালা বাগিয়ে ধরে। পাথর কিংবা ফল

ছুঁড়েও মারে হাত দিয়ে। শিম্পাঞ্জীরা আটকা পড়লে মানুষের দেখে ছোটখাট এটা-ওটা হাতের কাজও করতে শেখে। মানুষের না দেখেই, নিজের থেকেও পারে কিছুটা।

কিন্তু, মানুষের হাতের সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বনমানুষ, তা সে যতই কুলীন হোক-না-কেন, তারও হাত, আর মানুষেরও হাত! তুলনাই চলে না। কত শত শত সহস্র সহস্র বছর ধ'রে কত রকমের কাজে কত-মতোভাবে পরিশ্রম ক'রে মানুষের হাত পেকেছে, হাতের কেরামতি বেড়েছে।

বনমানুষের সঙ্গে মানুষের হাতের গড়নে মিল আছে অনেক। পেশীর পর পেশী, হাড়ের পর হাড়, কোন্‌টা কোথায় কিভাবে থাকে, তা মানুষ আর বনমানুষের অনেকটা একই রকমের। কিন্তু, অতি নিচু স্তরের যে-আদিম মানুষের কথা আগে বলা হয়েছে—সেই যাকে বলা হয়েছে মানুষ জাতির শৈশব—তখনকার মানুষও-যে কত রকমের কাজ করতে পারত, তার একটিও নকল করতে পারে কোন বানর? অসম্ভব। বানরজাতীয় কোন প্রাণী হাজার চেষ্টা করলেও পাথর থেকে একটা ছুরি তৈরি করতে পারে? নিতান্ত আনাড়ী ছুরি? কিছুতেই না।

তবুও, এই বনমানুষ থেকেই মানুষ।

এই পরিবর্তন ঘটতে-যে কত হাজার বছর লেগেছিল, তা আজও পাকাপাকি ঠিক করা যায়নি। সেই হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের সেই আনাড়ী পূর্বপুরুষেরা অত্যন্ত ধীরে ধীরে হলেও, এখানে-সেখানে হাত লাগাতে শিখেছিল। প্রয়োজনের তাগিদে। খাবার সংগ্রহের জন্যে। আত্মরক্ষার গরজে।

মূল হাতিয়ার—হাত

প্রথম দিকে সে-সব কাজ নিশ্চয়ই অত্যন্ত সহজ সরল ছিল। সবার নিচের স্তরের যে-আদিম মানুষ, তারাও-তো এই নর-বানরের থেকে অনেক উঁচু স্তরের জীব ছিল। কিন্তু, পশুর অবস্থা থেকেই সেই হাত ক্রমে কারিগরের

যোগ্যতা লাভ করেছে। কঠিন পাথর থেকে অতি আনাড়ী ছুরি তৈরি করেছিল সেই আদিম মানুষ। প্রয়োজনের তাগিদে। তবে, সেই অতি সাধারণ সামান্যতম যোগ্যতাটুকু আয়ত্ত করতেই-যে কত শ' হাজার বছর কেটে গিয়েছিল! তার তুলনায় আধুনিক মানুষের গত হাজার পাঁচেক বছর-তো সময়ের সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতো নগণ্য।

কিন্তু, অত শ' বছরের যে-আনাড়ী জীবন, তা শেষও হল। কী করে তা সম্ভব হল?

তা সম্ভব হল ঐ হাতের মুক্তিতে। সেই-যে হাত ছাড়া পেয়ে গেল, সেই থেকেই আনাড়ী পশুর জীবন ঘুচিয়ে দেবার গোড়াপত্তন হয়ে গেল। ছিল মাটিতে চলবার থাবা। সে ছিল ফল তোলার, ফল ধরবার, পাথর তুলবার থাবা। এবার হল সত্যিকার হাত। আনাড়ী থাবা থেকে হাত **আবিষ্কার** হল! কাজের ভেতর দিয়েই সেই হাতের দক্ষতা বেড়ে চলল। সূক্ষ্ম কাজ করবার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হল। বেড়েই চলল হাতের কেরামতি। আর, পুরুষানুক্রমে সেটা এগিয়ে চলল। শ্রমে হাতের ব্যবহারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল।

গরিলার হাত

অর্থনীতির পণ্ডিতেরা বলেন, দুনিয়ার যত ধনদৌলত সবই আসে শ্রম থেকে। যাবতীয় বিত্ত-সম্পদের উৎস এই শ্রমই। কথাটা খুব ঠিক। আবার, যে-সব জিনিস থেকে সবকিছু তৈরি হয়, তার যোগাদনদারও এই শ্রম। অবশ্য, সবার বড় যোগানদার-তো প্রকৃতি। কিন্তু, তারপরই শ্রমের স্থান। তাহলে' দেখা যাচ্ছে, কাঁচামালের যোগানদার হল শ্রম। সে-মালকে

মানুষের হাত

ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতেও শ্রম। কিন্তু, শুধু তাই নয়। শ্রমের বাহাদুরি আরও ঢের বেশি। মানুষের জীবন-তো খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই শুধু নয়। শিল্প আছে, সাহিত্য আছে, সংগীত আছে; কাব্য আর দর্শনের গরিমা আর সৌন্দর্য আছে; আছে বিজ্ঞান আর কল-কারখানার কত আশ্চর্য সৃষ্টি, কতই-না বিচিত্র তার ফলাফল! মানুষের জীবনের এই-যে বহুমুখী বিকাশ, এই-যে বহুমুখী অস্তিত্ব, এ সবকিছুর মূলেও সেই শ্রম। একদিক থেকে বলা যায়, মানুষকেই সৃষ্টি করেছে শ্রম। **শ্রমই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা।** আর, হাতই তার মূল হাতিয়ার।

নিজ হাতে গড়া দেহ

এই-যে আমাদের দু'খানি হাত, এর কত-না বাহাদুরি! মানুষ কী না করে এই হাত দিয়ে। সূক্ষ্ম মোটা কত বিচিত্রভাবে হাত চালিয়ে কত শত সহস্র রকমের কাজই-তো করা করা হচ্ছে। কিন্তু, আমাদের সেই নর-বানর পূর্বপুরুষরাই এই হাত আবিষ্কার করেছিল। তার আগে-তো হাত ছিল না; ছিল আনাড়ী থাবা।

হাত দিয়ে প্রধানত শ্রমসাধ্য কাজই করা হয়। অর্থাৎ হাত হল শ্রমের ইন্দ্রিয়। আবার এ হাত গড়ে উঠেছে শ্রমেরই ফলে। লোহাকে যেমন পিটিয়ে পিটিয়ে প্রয়োজন-মতো আকার দিয়ে গড়ে তোলা হয়—বনমানুষের আনাড়ী হাতও তেমনি নানা কাজের চাপে ক্রমে দক্ষতা অর্জন করেছে, তার গড়ন আর রূপও বদলেছে। বনমানুষের সেই হাত-তো পাথর ভাঙা, পাথর ছোঁড়া, পোকা-মাকড় ধরা, এইসব কাজই করত। কিন্তু, ক্রমে তাদের আরও কত নতুন নতুন রকমের কাজ করতে হয়েছিল। সেইসব নতুন নতুন কাজের সঙ্গে হাতকে একটু একটু করে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছিল। এই খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা আর তার সাফল্যের ফলে, সেইসব নতুন কাজের উপযোগী নতুন নতুন পেশী, নতুন নতুন সন্ধিবন্ধনীও দেখা দিল হাতে। তার একেকটি নতুন পেশী বা সন্ধিবন্ধনী লাভ করতে হাতের নিশ্চয়ই শত শত বছরের অধ্যবসায়

অধ্যবসায় প্রয়োজন হয়েছিল। এবং আরও বহুকাল ধরে চলার পর নতুন হাড়ও দেখা দিল। হাতের সেইসব নতুন সাজ-সরঞ্জামগুলি আবার পুরুষানুক্রমে এগিয়ে চলল।

এদিকে জীবনযাত্রাও ক্রমে জটিল হয়ে উঠতে লাগল। খাবার, আশ্রয় সংগ্রহ করবার নতুন নতুন উপায় বেরিয়ে গেল। হাতকেই সেইসব নতুন আর জটিল কাজ করতে হল। এমনি ক'রেই চলেছে ব্যাপারটা। বাঁচার প্রয়োজন, খাবার সংগ্রহের প্রয়োজন। অতএব হাত লাগানো চাই সম্ভব-অসম্ভব নানা কাজে, নানা জিনিসে। হাতের সেই সব নতুন কাজের ভেতর দিয়েই হাতের গড়ন উন্নত হল। দক্ষতা বেড়ে গেল। তখন আরও নতুন, আরও জটিল কাজ। ফলে, হাতের গুণে আরও উন্নতি, আরও বেশি দক্ষতা। এমনি করেই ঘটেছে হাতের ক্রমবিকাশ।

সেই হাতের আজ কত যোগ্যতা, কত দক্ষতা, কত কেরামতি! কামারশালে হাতুড়ি মারছে এই হাত; আধুনিক কল-কারখানায় সূক্ষ্ম কারিগরি কাজেও এই হাত। সেই হাত থেকেই আবার বড় বড় শিল্পীর ছবি, আঙুলের ঘায়ে সেতারের তারে ওঠে অপূর্ব ঝঙ্কার। কত অব্যক্ত ভাবাবেগ ফুটে ওঠে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আর কত গ্রাম্য মানুষের নাচে হাতের মুদ্রায়।—এসব হল সহস্র সহস্র বছরের শ্রম, অধ্যবসায়, সাধনার ফল।

অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক

এই হাত কিন্তু একাই একটা কিছু "স্বাধীন" বস্তু নয়। মানুষের দেহটাকে বলা যায়, বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি পরিবার। সেই পরিবারেরই একজন হল হাত। পরিবারেরই একজন, আবার প্রধান কর্মকর্তাও বটে। কাজেই, যাতেই হাতের ভাল হয়, বিকাশ ঘটে, তাতেই আবার গোটা দেহটারই উপকার হয়। তা হয় দু'রকমভাবে।

• তা আবার বেশ নিয়ম মেনে চলে। আপাতত মনে হতে পারে যে,

মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর দেহের একটা অঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ ও অংশের কোন সম্পর্ক নেই। আসলে কিন্তু দেহের একটি অঙ্গের রূপ-গুণ, আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে অন্য কোন-একটি অঙ্গের রূপ-গুণ, আকৃতি-প্রকৃতি একেবারে বাঁধা। তার মানে এই নয় যে, দুইয়ের আকৃতি-প্রকৃতি একই। তা নয়। দুইয়ের আকৃতি-প্রকৃতি, কাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু একের পরিবর্তন অন্যেরও পরিবর্তন ঘটায়—তা সে ভালোর দিকেই হোক, আর মন্দর দিকেই হোক। ডারউইন এই নিয়মের একটি নাম দিয়েছেন। বাংলায় তাকে বলা যায় 'অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কর নিয়ম।' ইংরেজীতে The Law of Correlation of Growth. এই জন্যেই, কোথাও কিছু খুব ঘনিষ্ঠ হলে বলা হয়: "অঙ্গাঙ্গি-ভাবে" জড়িত। আসলে, পৃথিবীতে সবকিছুই সবকিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যেমন মানুষের দেহের ভেতর, প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনায়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, তেমনি মানুষের সমাজে-রাজনীতিতেও।

মানুষের দেহে এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের নিয়মের একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। রক্তে দু' রকমের কোষ থাকে: লাল আর সাদা। যে-সব প্রাণীর রক্তে লাল কোষগুলির কেন্দ্রে নিউক্লিয়স থাকে না, এবং মেরুদণ্ডের প্রথম অস্থির সঙ্গে তাদের ঘাড় যুক্ত থাকে ডবল বাঁধুনি দিয়ে—তাদের দেহে বিশেষ এক রকমের গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড থাকে। সেই গ্রন্থি থাকার ফলে স্তনে দুধ জন্মে, বাচ্চা খেয়ে বাঁচে। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। এ উদাহরণটা একটু শক্ত মনে হতে পারে। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

স্তন্যপায়ী জীবের ভেতর যাদের খুর চেরা, তাদের পাকস্থলী কখনও একটি নয়। রোমন্থন করবার জন্যে, অর্থাৎ চর্বিত-চর্বন করবার জন্যে, অমনি দরকার হয়। আবার নিখুঁত সাদা যে-সব বিড়ালের চোখ নীল, তারা কালা হবেই; তারা কানে শুনতে পায় না। যে-কারণে সাদা দেহে নীল চোখ হয়, সেই কারণেই শ্রবণশক্তির দিকটা নষ্ট হয়ে যায়। এমনই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক।

এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে, এই রকম হতে

দেখা গেছে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। অতএব, একে নিয়ম বলে ধরতে কোন বাধা নেই।

বনমানুষ থেকে মানুষ সৃষ্টি হল—এই-যে বৈপ্লবিক রূপান্তর, এখানেও ওই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ব্যাপার। অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ধারা অনুসরণ ক'রেই এই বিরাট রূপান্তরের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

হাত আর মাথা

এইবার আমাদের সেই মূল কথায় ফিরে আসা যাক। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বনমানুষ মানুষ হয়ে গেল ?

গরিলার দেহ গরিলার কঙ্কাল মানুষের দেহ মানুষের কঙ্কাল
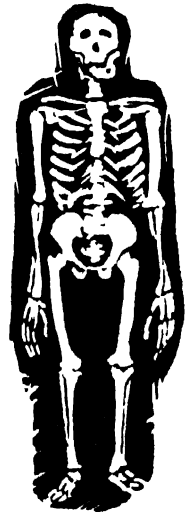
তাই হল। তবে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়। ওই হল গোড়াপত্তন। এই সোজা হয়ে চলবার যে-চেষ্টা, তার ভেতর দিয়েই মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘ'টে গেল। এই-তো সবচেয়ে বড় ঘটনা। কারণ, মানুষ-যে আর সব প্রাণী

থেকে বড়, সে-তো গায়ের জোরে নয়, মাথার জোরে। দেহ পরিবারের সভাপতিই-তো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের আদেশে নির্দেশে হাত, পা, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্ম চলে। সেই মস্তিষ্কেরই পরিবর্তন ঘটল সোজা হয়ে দাঁড়াবার ফলে। বনমানুষের মস্তিষ্ক ক্রমে পরিণত হয়ে মানুষের মস্তিষ্ক গ'ড়ে উঠল।

কীভাবে তা সম্ভব হল?

দু'পায়ে সোজা হয়ে চলবার চেষ্টার ভেতর দিয়ে দেহটা ক্রমে সোজা ক'রে তুলতে হল। মাথাটা না ঝুঁকিয়ে সোজা রাখবার চেষ্টা সুরু হল। তার ফলে দেহে দুটো পরিবর্তন ঘটল। মাথার খুলির নিচেকার যে-গর্তটা দিয়ে মেরুদণ্ড গিয়ে মস্তিষ্কে যুক্ত হয়, সেই গর্তটা ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে এল। এই হল একটা পরিবর্তন। আরেকটা হল কী? হাতের কবজির গাঁট মাটিতে ফেলে চলতে মাথাটা-তো সামনের দিকে ঝুঁকে থাকত। আর, সেই ঝুঁকে-পড়া মাথাটাকে জায়গা-মতো ধ'রে রাখবার জন্যে ঘাড়ের পেছনটায় অনেকটা পেশী দরকার হত। এখন, মাথাটা যতই সোজা হতে লাগল, সেই পেশীর প্রয়োজনও একটু একটু ক'রে ক'মে যেতে লাগল। মাথার খুলির নিচেকার সেই গর্তটাকে বলা হয় মহাবিবর। সেই গর্তটার জায়গাটা বদল হল—একটু একটু সরে সরে যেতে লাগল। আর, ঘাড়ের পেছনকার পেশীও ক'মে গেল। এবং তার ফলে, মস্তিষ্কের বিকাশে অনেক সাহায্য হল।

আবার, চলার কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে হাত-যে এটা-ওটা করতে লেগে গিয়েছিল, সে-তো জীবনধারণের প্রয়োজনেই। কিন্তু, তার জন্যে নানা জিনিস নানাভাবে ধ'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করতে হত তো। ইতি-মধ্যে আবার দৃষ্টিশক্তিরও বিকাশ ঘটেছে। সেও ওই নতুন নতুন কাজের ভেতর দিয়ে। নতুন নতুন জিনিস—তাদের কাজে লাগাবার কায়দাও নতুন। কাজেই তাকে দেখতে শিখতেও হয়েছে নতুন ক'রে। লম্বায় চওড়ায় ঘনত্বে মিলিয়ে একটা জিনিসের মোট চেহারাটা দেখবার বুঝবার ক্ষমতা এসেছে

এমনি ক'রে ধীরে ধীরে। এমনি ক'রে দেখতে না শিখলে বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতিও বোঝা যেত না। কোন একটি জিনিসকে প্রয়োজন-মতো কাজে লাগাবার ক্ষমতাও এল এরই ভেতর দিয়ে। এই-যে কোন কিছুকে দেখে বোঝা, আর বুঝে তাকে কাজে লাগানো—এরই ভেতর দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি, বিচার-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি দেবার ক্ষমতা।

তারও প্রভাব গিয়ে পড়ল মস্তিষ্কের ওপর। চোখে দেখা, কানে শোনা, স্পর্শে অনুভব করা, এ সবকিছুর সঙ্গে মস্তিষ্কের যোগাযোগ রয়েছে। এবং ঐ দেখা শোনা জানা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই নানা জিনিসকে নানা কাজে লাগাবার চেষ্টা চলেছে—হাত দিয়ে কতো রকমে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে তার জন্যে। এরই ভেতর দিয়ে একের ওপর অন্যের প্রভাবে, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ফলে, মানুষের মস্তিষ্কে এল বস্তুর রূপ-সৌন্দর্যের অনুভূতি।

এই যে সৌন্দর্যতত্ত্ব, কান্তিবিদ্যা, শিল্পকলার বিজ্ঞান—এ আজকাল বড় বড় পণ্ডিতদের অতি উচ্চ স্তরের আলোচনার, গবেষণার বিষয়। অনেকে একে মাটির পৃথিবী-ছাড়া, মানুষের বুদ্ধির বাইরে এক রহস্যলোকের বস্তু ক'রে তুলেছেন। বাস্তব সমাজ জীবনের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগই নেই তাঁদের মতে। কিন্তু, এই-যে কান্তি-সৌন্দর্যের অনুভূতি, এর সৃষ্টি হয়েছিল সেই আদিম মানুষের অতি অপরিণত মস্তিষ্ক গড়ার পথেই। অতি আনাড়ী, অতি স্থূল জীবনধারণের চেষ্টার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল এই অনুভূতি। তারপর তার বিকাশ ও উৎকর্ষ ঘটেছে অতি সূক্ষ্ম জটিল পথে। হাতের কাজের সঙ্গে মস্তিষ্কের সোজাসুজি যে-যোগাযোগ ছিল, তাও ইতিমধ্যে কখন কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই হারানো সূত্রটি খুঁজে পেলে খুব গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের নিয়ম ধ'রে, ওইসব 'রহস্য' ঘুচে যাবে। আর্টের সঙ্গে, আর্টের মূল উৎসের সঙ্গে, সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাবে।

মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় এ প্রসঙ্গ অবশ্য অনেক পরের

কথা। কাজেই আমরা সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে যাই। আমাদের মস্তিষ্ক এখন সবে গ'ড়ে উঠছে।

শিল্পী হাত

চলা-ফেরার কাজ থেকে হাত ছাড়া পাবার আগে কী ছিল। খাবার জিনিস টুকরো করা, কিছু একটা ধরা, কিংবা একটা কিছু ছিঁড়ে ফেলা—এই

গরিলার মাথা

মানুষের মাথা

সব কাজ করতে হতো দাঁত দিয়ে চোয়ালের জোরে। কিন্তু হাত ছাড়া পে
কঠিন কাজগুলির ভার নিয়ে নিল। দেহ-পরিবারে একটি উপযুক্ত ভৃত

পাওয়া গেল। দাঁত আর চোয়ালের কাজের চাপটাও কমে গেল বেশ কিছুটা। ফলে, মাথার খুলির ওপরে যে-পেশী থাকে, তার চাপও কমে গেল। এ-সব কিছুরই একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। কাজ বদলের ফলে, মাথার সংস্থানই বদলে গেল। শক্ত কাজ করবার দায় থেকে চোয়ালটা রেহাই পাবার ফলে, মাথাটা এমন এক অবস্থায় এল, যাতে খুলির ভেতর বেশি মস্তিষ্কবস্তুর জায়গা হয়।

এমনিভাবে, দাঁত আর চোয়ালের চেহারাই বদলে গেল। সেই সামনের দিকে এগিয়ে-যাওয়া বাঙুরে মুখ আর নয়। তা নইলে আমাদের মুখে সেই বনমানুষের ভেঙচিই লেগে থাকত, 'মধুর হাসি' ফুটত না।

এর আগে আবার দেখা গেছে, আমাদের কত সব 'স্বর্গীয়' বস্তু, যেমন সংগীত, শিল্প-কলা, সৌন্দর্যবোধ—সে সবকিছুরই মূলে রয়েছে ঐ হাতেরই কেরামতি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে—হাত, মাথা, চোখ, কান, এদের প্রত্যেকেই অপরের শক্তি বিকাশে সাহায্য করেছে। একক একলসেঁড়ে-তো নয় কিছুই। সম্পূর্ণ খামখেয়ালীভাবে কেউ-তো একেবারে নিজের মতো চলে না কিনা। সব মিলিয়ে তবে গোটা মানুষটা। এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের নিয়মে, দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পরিবর্তিত হয়েছে। সে-সব আলোচনা আমরা এখানে করব না। তা হলে হয়ত আবার সেই সৌন্দর্যতত্ত্বের মতো দূরে গিয়ে পড়তে হবে।

হাতের মুক্তির ফলে বনমানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কীভাবে ক্রমে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে উঠল, তারই কয়েকটি দিক দেখানো হল। এইসব পরিবর্তনের পথ বড় জটিল। কিন্তু, বেশ সোজা পথেও ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। সেই কথাই এবার আলোচনা করা যাক।

কথা ফুটল মুখে

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের সেই গেছো পূর্বপুরুষরাও দলবদ্ধ হয়ে বা করত। মানুষ-তো আর সব জীবের চেয়ে মিশুক, সামাজিক। এই-ে মিশুক সামাজিক প্রকৃতি, এ জিনিসও গ'ড়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে।

নেহাৎ জীবনধারণের প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ প্রকৃতির ওপর কি কিছু সর্দারি করবার চেষ্টা শুরু করে। যাকে বলে খোদার ওপর খোদ্‌কারি হাতের সেই মুক্তির পরই এই অভিযান শুরু হয়। শ্রমের ভেতর দিে চলেছে এই অভিযান।

সেই চেষ্টায় মানুষ এক-এক পা এগিয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে তার আশা আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে গেছে। আরও নতুন আরও বড় কিছু করবার নতুন সুযো আর যোগ্যতাও বেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। নতুন নতুন কাজ নতুন নতুন জিনিস কাজেই জিনিসগুলির গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞানও বাড়ে। এবং এরই ভেতর দি মানুষের কাজ করবার, শ্রম করবার ধরন-ধারন কায়দা-কানুনও বদলে গেছে

এমনি ক'রে, ক্রমে এমন সব কাজ এসে জুটেছে যাতে অনেক লো একসঙ্গে হাত লাগাতে হয়। যেমন, বুনো ঘোড়ার পালকে তাড়া ক'রে গ ফেলবার কাজটা। কিংবা, ম্যামথ জন্তুটার যাতায়াতের পথে গর্ত খুঁ ডাল-পাতা দিয়ে লুকিয়ে তাকে শিকার করার কাজটা। সবই খাবারে জন্যে। অনেকে মিলে এসব কাজ করতে গেলে, কিছুটা শৃঙ্খলাও থা দরকার। আবার, এমনিভাবে কাজ করবার সুবিধাটাও সবার কাছে বে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, একলা ঘুরে কিছু শিকার মেলা ভার।

এমনিভাবে, কাজের ভেতর দিয়ে, শেষে নিজেদের ভেতর **কিছু বলবার** একটা প্রয়োজন দেখা দিল। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গেলে এ প্রয়োজন হবেই। এই প্রয়োজনের তাগিদেই কথা বলবার একটা ব্যবস্থার দরকার হয়ে পড়ল। কী রকম? ধরা যাক, বুনো ঘোড়া শিকারের কথা। ঘোড়াগুলোকে তাড়া ক'রে নিয়ে যেতে হবে একটা নির্দিষ্ট দিকে—যেদিকে আর পথ নেই, সামনে গভীর খাদ। মশাল জ্বেলে, ভয় দেখিয়ে, হৈচৈ ক'রে তাড়া করতে হবে চারিদিক থেকে। "আরে, এদিকে নয়, ওদিকে", "মশালটা এদিকে", এমনি সব কথা বলবার দরকার হবেই।

কিন্তু, একবারে-তো কথা বলে উঠতে পারেনি সেই আদিম মানুষ। হয়ত অস্ফুট চিৎকার করেছে, কিংবা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করেছে, কিংবা দুইই একসঙ্গে করেছে বোবা মানুষের মতো। এমনি ক'রে কাজের ভেতর প্রয়োজনের তাগিদে, আপ্রাণ চেষ্টার ফলে, বনমানুষের অপরিণত কণ্ঠা একটু একটু ক'রে বদলেছে। কণ্ঠাতেই স্বর সৃষ্টি হয়। সেই কণ্ঠা ক্রমে আরও স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করবার মতো উপযুক্ত হয়ে উঠল।

অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যায়, এমনি করে কাজের ভেতর শ্রমের ভেতর দিয়েই ভাষার উৎপত্তি হয়। অন্যান্য প্রাণীদের ভেতর যারা খুব উঁচু দরের, তাদের যা-কিছু প্রয়োজন তা প্রকাশ করবার জন্যে কোন স্পষ্টোচ্চারিত ভাষার প্রয়োজন হয় না। কথা বলবার তাগিদ তাদের আসে না। কথা বলতে না পারবার যে অক্ষমতা, সে-বোধও তাদের আসতে পারে না। আবার, মানুষের ভাষা বুঝবার কোন দরকারও তাদের নেই। কিন্তু, মানুষের পোষ মানলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যায়। মানুষের সংস্পর্শে এসে ঘোড়া আর কুকুরের শুনবার শক্তিতে পরিবর্তন ঘটে। তাদের শ্রবণশক্তির উন্নতি হয়। ক্রমে তারা কিছু স্পষ্টোচ্চারিত শব্দ শুনতে এবং বুঝতে শেখে। কিন্তু, তাদের বুদ্ধির দৌড় আর কতদূর? ধরা-বাঁধা গণ্ডির বাইরে বেশি কিছু তারা বুঝতে পারে না। তোতাকে অনেকে গালি শেখায়,

বাড়িতে মানুষ এলে বসতে বলতে শেখায়, খাবার জিনিস চাইতে শেখায়। তাকে বিরক্ত করলে গালি বলে ; লোক এলে বসতে বলে।

কথা আর কাজে মিলে

সে যা-ই হোক, দেখা গেল, শ্রম থেকেই শুরু এবং পরে সেই শ্রমের সঙ্গেই যোগ হল স্পষ্টোচ্চারিত কথা। কথারও-তো উৎপত্তি আবার শ্রমেরই ভেতর দিয়ে। এবার, এই শ্রম আর স্পষ্টোচ্চারিত কথা, এই দুইয়ে মিলে বনমানুষের মস্তিষ্কটাকে বদলে দিল—বনমানুষের মস্তিষ্কটাই ক্রমে উন্নত হয়ে মানুষের মস্তিষ্কে পরিণত হল। বনমানুষের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের মিল আছে। কিন্তু, মানুষের মস্তিষ্ক অনেক বড় এবং উন্নত ধরনের। মস্তিষ্কের এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অনুভূতির ইন্দ্রিয়গুলিরও উন্নতি হল—যেমন, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ইত্যাদি। এইগুলিই-তো মস্তিষ্কের খাস হাতিয়ার। এদের নিয়েই মস্তিষ্কের কাজ-কারবার। কথা বলবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন শুনবার শক্তিরও উন্নতি হয়—মস্তিষ্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় আরও সতেজ, আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। ঈগল পাখি মানুষের থেকে অনেক বেশিদূর অবধি দেখতে পায়। মানুষ অতদূর অবধি দেখতে পায় না, কিন্তু একটা জিনিসের ভেতর অনেক বেশি কিছু দেখবার ক্ষমতা আছে মানুষের। যেমন—জিনিসের আকার প্রকার পরিধি রূপ। সে-দৃষ্টি, সে-ক্ষমতা নেই ঈগলের।

আবার—বনমানুষের স্পর্শের অনুভূতি অত্যন্ত আনাড়ী রকমের। মানুষের স্পর্শশক্তি কত সূক্ষ্ম, কত বিভিন্ন রকমের। এত রকমের এত বিচিত্র এত সূক্ষ্ম স্পর্শের অনুভূতিও হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। এরও মূলে সেই শ্রম।

শ্রমের ভেতর দিয়ে, কাজের ভেতর দিয়ে মুখে কথা ফুটল। এই শ্রম আর কথা বলবার প্রয়োজনের তাগিদ আর প্রচেষ্টা—এইসব মিলে মস্তিষ্ক গ'ড়ে

তুলল। সৃষ্টি হল নতুন নতুন অনুভূতি, নতুন নতুন শক্তি আর তার উপযোগী নতুন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর ইন্দ্রিয়।

এরই ভেতর দিয়ে চেতনা ও চিন্তা শক্তির বিকাশও হল। নিম্নতর প্রাণীর কাছে এক খণ্ড পাথর নেহাতই একখণ্ড পাথর। কিন্তু মানুষের কাছে তার নানা দিক আছে। শ্রমের ভেতর সেই পাথর তাকে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। আবার, মস্তিষ্কেরও উন্নতি হয়েছে। তাই, মানুষের কাছে ধরা পড়ল পাথরের রূপ-গুণ, আকৃতি-প্রকৃতি। বিচার-বিবেচনা-যুক্তির ক্ষমতাও এল ক্রমে।

শ্রম আর কথা বলবার শক্তির যোগাযোগে-তো সৃষ্টি হল এইসব শক্তি। এবং এগুলিই আবার শ্রম ও কথা বলবার শক্তিকে আরও উন্নত করে তুলল। এখানেও সেই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের নিয়ম। সে-নিয়ম দেহের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরেও কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের নিয়ম একেবারে সর্বব্যাপী। কী মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর দেহে, কী সমাজে, কী প্রকৃতির রাজ্যে—সর্বত্রই এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। পারস্পারিক সম্পর্ক ও সংগতি রেখে চলেছে সবকিছু। একেবারে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কিছুই।

সমাজ গড়ার কথা

চিন্তাশক্তি আর বিচার-বিবেচনার শক্তি-তো শ্রম আর কথা বলবার শক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলল। একের ওপর অন্যের প্রভাবে দুইয়েরই উন্নতি হতে লাগল। এবং ক্রমে বানরজাতীয় প্রাণী থেকে উন্নত ধরনের এক প্রাণী সৃষ্টি হল : সে হল মানুষ।

কিন্তু বিকাশের ওই ধারা এইখানেই শেষ হয়ে গেল না। এগিয়েই চলল—বেশ জোরের সঙ্গেই এগিয়ে চলল। এই গতিবেগ কখনও কমেছে, কখনও বেড়েছে। আবার একই পথেই চলেনি সব সময়ে—দিক বদলেছে। কোথাও গিয়ে হয়ত কিছুকালের জন্যে থেমেও গেছে—এমনকি, পিছুও হটেছে—কিন্তু সে নিতান্ত সাময়িকভাবে। শ্রম ও কথা বলবার শক্তি একদিকে, আর অপর দিকে হল মস্তিষ্ক ও তার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। এদের একের প্রভাবে অন্যের উন্নতির ও বিকাশের যে-ধারা তা মোটের ওপর এগিয়েই চলেছে। সাময়িক কোন বাধা-বিপত্তি থাকলেও, এগিয়ে চলেছে।

এগিয়ে চলল। কিন্তু, কোন্ পথে, কোন্ দিকে? পথ আর দিক ঠিক করল কে?

পুরোপুরি মানুষ গ'ড়ে ওঠার পর মানুষের যে-সমাজ গ'ড়ে উঠল, সেই সমাজই দিক ঠিক করল। সমাজের প্রয়োজনেই পথ। সেই কথাই এবার আলোচনা করা হবে। কিন্তু, তার জন্যে কিছু গোড়ার কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

আমরা জানি—গলিত বস্তুরাশি থেকে ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে আমাদের এই পৃথিবী ক্রমে গাছপালা আর অন্যান্য প্রাণীর জীবন সৃষ্টির উপযোগী হয়।

অতি আদিম গাছপালা আর জীবজন্তু-যে প্রথম দেখা দিল, সে কবে? পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, সে হল গিয়ে ১৫০০০ লক্ষ বছর আগেকার কথা।

সে যা-ই হোক, দলবদ্ধ গেছো বানর থেকে মানুষের সমাজ গ'ড়ে উঠতে নিশ্চয়ই লাখ লাখ বছর কেটে গিয়েছিল। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় সে-সময়টা সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতো হলেও, আমাদের পক্ষে তা-ই কল্পনা করা একরকম অসম্ভব। কিন্তু, শেষপর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি হল। মানুষের সমাজ গ'ড়ে উঠল। মা ধরিত্রীর বয়সের সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্যের সামিল হলেও, মানুষ আর মানুষের বয়স আজকের মানুষের কল্পনাতীত হলেও—মানুষ আর তার সমাজ গ'ড়ে উঠেছে শেষপর্যন্ত।

বানরও দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। সে-ও ছিল এক রকমের সমাজ। আবার, মানুষও দলবদ্ধ হয়ে সমাজ গ'ড়ে তুলল। কিন্তু পার্থক্য আছে; এবং বিরাট পার্থক্য। কোথায় পার্থক্য? কিসের পার্থক্য?

—এখানেও সেই শ্রম।

বনমানুষের পাল কী করত? নিজের দলের গণ্ডির বাইরে তেমন যেত না। কোন একটা অঞ্চলে ফল-মূল, ডালপালা চিবিয়ে কোনমতে দিন কেটে গেলেই ব্যস্, খুশি। ঠাণ্ডার দেশে একরকম খাবার মেলে, গরমের দেশে আর একরকম। উত্তরে একরকম, দক্ষিণে একরকম। এই ভৌগোলিক অবস্থান আর আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী যা মেলে তাই খেয়েই কোনমতে বেঁচে থাকা। এই-তো বনমানুষের জীবন! তবে প্রকৃতির নিয়মে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে, বনমানুষের খাবারের যোগান নিঃশেষ হয়ে গেলে কিন্তু গণ্ডি পেরিয়ে বেরুতে হত। তখন খাবারের সন্ধানে যেতে হত অন্যত্র। হয়ত, আর একটা অঞ্চলে গিয়ে আর এক পাল বনমানুষের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাদের জায়গাটা দখল করতে হত। এই আজকালকার যুদ্ধবিগ্রহের মতোই।

কিন্তু, প্রকৃতি তার মর্জিমাফিক যা দিয়ে রেখেছে, তার বেশি কিছু ফলিয়ে গজিয়ে তুলবার ক্ষমতা বনমানুষের ছিল না। তবে, তাদের মল-মূত্র সার হয়ে

জমির উর্বরাশক্তি বাড়াত নিশ্চয়ই। কিন্তু তা জানবার বুঝবার মতো বুদ্ধি তাদের ছিল না। এমনি ক'রে, খাবার জোটাবার মতো বন-জঙ্গল আর খালি রইল না। কাজেই, তাদের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গেল। খাবার না থাকলে তা হয় না। ফলে, বনমানুষের মোট সংখ্যাটা বড়জোর সমান সমান থেকে যেতে পারে।

তার ওপর আবার, ভবিষ্যতের কথা ভাববার মতো বিচার-বিবেচনা-শক্তিও-তো ছিল না। ফলে, খাবার নষ্ট হয় প্রচুর। একটা গাছ হয়ত অঙ্কুরেই কিংবা চারা থাকতেই খেয়ে শেষ করে দিল। গাছটা বড় হলে কত ফল-ফুল, ডাল-পাতা দিত! সে বুদ্ধি নেই, সে হিসেব করবার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু, মানুষ শিকারী কী করে? বাচ্চা হরিণটাকে মারে না—পরের বছরের জন্যে রেখে দেয়; পরের বছর বড় হবে, বেশি মাংস হবে। আর নেকড়ে? যা পায় খেয়ে শেষ ক'রে দেয়। তা সে বাচ্চাই হোক, আর বুড়োই হোক। পাহাড়ের ছাগলরা যেমন—বড় বড় ঝোপঝাড় হয়ে উঠবার আগেই সব খেয়ে একেবারে মুড়িয়ে দেয়। কথায় বলে, ছাগলের চোপা! মোটের ওপর, এদের ব্যাপারটা হচ্ছে কী রকম? যেন লুঠের মতো। যা পেয়েছ, গোগ্রাসে লুটপাট ক'রে খেয়ে নাও। ভাবনাচিন্তের বালাই নেই। ভাবনাচিন্তের ক্ষমতাই নেই। কাজেই, মানুষের মতো বিলিব্যবস্থা কিংবা পরিকল্পনার কথাই ওঠে না।

মানুষও-যে সব সময়ই খুব বিলিব্যবস্থা ক'রে, পরিকল্পনা ক'রে চলে, তা নয়। এক একটা সংসারে হয়ত কিছুটা বিলিব্যবস্থা আছে। কিন্তু সারা দেশে? ওই লুটের ব্যাপার। চোরাকারবারি সব লুটপাট ক'রে নিয়ে গেল, চাল পচল তার গুদামে—লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরল। জন্তু-জানোয়ারের দশা একেবারে কাটেনি। তবে, সোবিয়েৎ দেশে ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে কেউ কাউকে ঠকিয়ে খাবার কথা ভাবতেই পারে না। সবটাই আগে

থেকে বিলিব্যবস্থা ক'রে ঠিক হয়। যাকে বলে সোবিয়েতের পাঁচ-সালা পরিকল্পনা। পাঁচ-পাঁচ বছরে বিলিব্যবস্থা ক'রে তবে চল।

সে যা-ই হোক। সুসভ্য মানুষের সমাজে যা আজও সর্বত্র সম্ভব হয়ে ওঠেনি, পশুর সমাজে তা একেবারেই ছিল না। কাজেই, খাবারের সন্ধানে ঘুরতে হয়েছে নতুন নতুন জায়গায়। এমনি ক'রে কত রকমের জীব-জন্তু একেবারে ঝাড়েমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

বনমানুষের ভেতরও রকমভেদ ছিল। তার ভেতর যাদের বুদ্ধি ছিল সবচেয়ে বেশি, তারাই বেঁচে গেল। নতুন জায়গায় নতুন অবস্থার সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে নিতে শিখল তারা। তারা আরও সব গাছপালা খুঁজে বের করল। ঝাড়েমূলে না খেয়ে একটু বাছবিচার করতে লাগল। ফলে, খাবারের রকম বেড়ে গেল। কিন্তু, একেও ঠিক শ্রমের ফল বলা চলে না। সেই-যে বলা হয়েছে, পশু আর মানুষের সমাজের মাঝে যে-বিরাট পার্থক্য, সে হল শ্রমেই—সে শ্রম কিন্তু এ নয়।

সে তা হলে কী রকম ?

খাওয়া-পরা-থাকা

নানা রকমের হাতিয়ার তৈরি করা থেকেই আসল শ্রম শুরু হল জীব-জন্তুরাও দাঁত, নখ কিংবা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে নানা কাজ করতে পারে। কিন্তু, ঠিক সেইসব কাজ করবার জন্যেই সেই আদিম মানুষের নানা হাতিয়ার দরকার হয়েছিল। মাটি খুঁড়ে শিকড় বের করবার জন্যে, থাকবার আস্তানা তৈরি করবার জন্যে, শিকার করবার জন্যে।
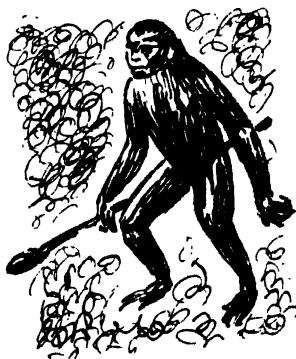
সেই আদিম মানুষ যেসব হাতিয়ার দিয়ে কাজ করত, তার অনেক রকম হাতিয়ার পাওয়া গেছে মাটির তলা থেকে। আবার, এখনও বহু অসভ্য জাতি বাস করে। তাদের জীবন অনেকটা সেই আদিম মানুষের মতোই। তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী থেকেও আদিম মানুষের হাতিয়ার সম্পর্কে অনেক-কিছু জানা যায়। শিকার আর মাছ ধরবার হাতিয়ারই সবচেয়ে পুরনো। ঐ শিকারের হাতিয়ারই দরকারের সময় হত লড়াইয়ের অস্ত্র।

মাছ-মাংস সেই প্রথম

মানুষ যখন শিকার করতে আরম্ভ করেছে, মাছ ধরতে শিখেছে, তখন তার খাবারের তালিকায় নিশ্চয়ই মাছ-মাংসও যোগ হয়েছে। তার আগে খাবার ছিল শাকসবজি আর ফলমূল—একেবারে নিরামিষ।

আমরা যে-খাবার খাই, তাই দিয়েই আমাদের দেহ গ'ড়ে ওঠে, দেহের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয়। এবং, এক-এক রকম খাবারের এক-এক গুণ। তাই, সম্পূর্ণ নিরামিষাশী মানুষ যখন

প্রথম মাছ-মাংস খেতে আরম্ভ করল, তখন সে-খাবারের প্রভাবে তার দেহের অনেক পরিবর্তন ঘটল। আমরা জানি, শরীরের বিভিন্ন অংশ পুষ্টি টেনে নেয় রক্ত থেকে। খাবারে মাছ-মাংস থাকলে এই প্রক্রিয়াটি আরও ভালভাবে চলে। এবং তার ফলে হজমশক্তি বেড়ে যায়—হজম করতে সময় লাগে আরও কম। আবার, শুধু পুষ্টি হলেই চলে না, দেহের বৃদ্ধিও চাই। মানুষের দেহের বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন-কোন প্রক্রিয়া চলে অনেকটা গাছপালার প্রক্রিয়ায়। খাবারে মাছ-মাংসের গুণে দেহের বৃদ্ধির সেইসব প্রক্রিয়া আরও ভালভাবে চলে।

খাবারের তালিকায় মাছ-মাংস যোগ হওয়ার ফলে তাহলে দুটি পরিবর্তন ঘটল : হজমের সময় কমে গেল এবং দেহবৃদ্ধির প্রক্রিয়া আরও দ্রুত চলল। এই দুইয়ে মিলে কী হচ্ছে? না, সময় বেঁচে যাচ্ছে—হজম হতে আর তত সময় লাগে না; দেহের যেটুকু বৃদ্ধির জন্যে হয়ত এক বৎসর সময় লাগত, সেটুকু আরও কম সময়ে হচ্ছে; এবং ফলে, দেহ গঠনের মালমশলা বেশি পাওয়া যাচ্ছে, শক্তির অপচয় কমে যাচ্ছে। এই-যে বাড়তি মালমশলা আর শক্তি—এই দিয়ে মানুষের আসল প্রাণীসুলভ প্রকৃতি গঠনে অনেক সুবিধা হয়েছে। এরই ফলে মানুষ উদ্ভিদ জগৎ থেকে আরও স্বতন্ত্র, আরও উন্নত হয়ে উঠেছে।

খাদ্য ও স্বাধীনতা

এই-যে সময়টা, এই সময়েই মানুষ গ'ড়ে উঠছিল। তখনও-তো দেহের গঠনে, মস্তিষ্কের শক্তিতে মানুষ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সেই সময়েই শাকসবজির সঙ্গে যোগ হল মাছ-মাংস। এই খাবারের গুণে মানুষের দৈহিক শক্তিও বেড়েছে। আবার, স্বাধীনতাও বেড়েছে। কিসের স্বাধীনতা? ইংরেজ-মার্কিনের গোলামি থেকে স্বাধীনতা নয়। কিংবা, জমিদার আর পুঁজিপতির শোষণ থেকে স্বাধীনতা নয়। সে-স্বাধীনতা-তো আমরা আজও পাইনি। মানুষের ওপর মানুষের যে-প্রভুত্ব, তা শেষ হতে পারে একমাত্র সমাজতন্ত্রী

সমাজে—যেমন হয়েছে সোবিয়েৎ দেশে। এখানে বলা হচ্ছে প্রকৃতির দাসত্বের কথা—প্রকৃতির খেয়ালখুশি থেকে স্বাধীনতার কথা। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নয়: তা হতেই পারে না। আংশিক স্বাধীনতা। সে কী রকম?

খাবারের জন্যে যদি শুধু শাকসবজির ওপরই নির্ভর করতে হয়, তাহলে কী হয়? শাকসবজি-ফলমূল নেই-তো—অনাহার। যেমন আমরা দেখেছি আগে হতো—এক-এক ঋতুতে কোন খাবার পাওয়া যেত না। মনে রাখতে হবে, তখনও মানুষ নিজের চেষ্টায় চাষ ক'রে ফসল ফলাতে শেখেনি। এখন কী হল? শাকসবজি থাকুক, চাই না-থাকুক, মাছ খাও, মাংস খাও। এইটুকু স্বাধীনতা। এইটুকু মাত্র। কিন্তু মানুষের সেই শৈশবে এইটুকুই ছিল খুব বড় —এইটুকুর ওপরই জীবন-মরণ।

খেতে-খেতে নতুন আবিষ্কার

মস্তিষ্কের ওপরও আবার এই মাছ-মাংসওয়ালা খাবারের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন সব মালমশলা আছে মাছ-মাংসে, যা মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বৃদ্ধির জন্যে না-হলে-নয়। খাবারে মাছ-মাংস যোগ হবার পর থেকে মস্তিষ্কের পুষ্টি আর বৃদ্ধি আরও ভালভাবে চলল। এবং পুরুষানুক্রমে তা এগিয়ে চলল। এ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে। যারা নিরামিষাশী তাদের কি বুদ্ধি নেই? —আছে। কিন্তু, তারা দুধ খায়, দুধের থেকে তৈরি কত খাবার খায়। মাছ-মাংসের যা আসল পুষ্টিকর উপাদান, ঠিক তাই-তো দুধেরও সারবস্তু নিরামিষাশীরাও নিশ্চয়ই সম্মানীয়। কিন্তু, ভুললে চলবে না যে, মাছ-মাংসের খাবার খেয়েই মানুষ মানুষ হয়ে উঠেছে। সেই শাকসবজির খাবারেই বাঁধা পড়ে থাকলে কী হত? উন্নত ধরনের বনমানুষ থেকে সেই-যে ক্রমে মানুষ গড়ে উঠল, তা আর হত না। আগেই বলা হয়েছে—জীবনধারণের জন্যে বাধ্য হয়েই আমাদের সেই গেছো পূর্বপুরুষেরা মাটিতে নেমে এসেছিল নতুন

খাবারের সন্ধানে। ক্ষীরসমুদ্র কিংবা দুধের পুকুর পেলে তারা নিশ্চয়ই জন্তু-জানোয়ারের পেছনে ছুটোছুটি করে মরত না।

অবশ্য, এই মাছ-মাংস ভোজনের অভ্যাস থেকেই আদিম মানুষের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে মানুষখেকো অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল। হাজার খানেক বছর আগে অবধিও কোথাও-কোথাও মা-বাবাদের ধ'রে খেত ব'লে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তা ভেবে আমাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই ; সে-তো অতীতের কথা। তবে, এখনও-যে বেশ সুসভ্য উপায়ে মানুষের রক্ত শুষে খাবার ব্যবস্থা আছে! কৃষক-শ্রমিক তিলে তিলে রক্ত-জলকরা শ্রম দিয়ে যে-সম্পদ সৃষ্টি করে, তাই চুরি ক'রেই জমিদার-পুঁজিপতির পুষ্টি হয়। এই হল আমাদের সমাজের আসল কলঙ্ক, আসল লজ্জার কথা।

আবার খাবারের কথায় আসা যাক। ঐ মাংস খাওয়া থেকেই দুটি বিরাট আবিষ্কার ঘটেছিল। সেই দুটি আবিষ্কারই রয়েছে মানুষের সমস্ত সভ্যতার মূলে।—আগুন আর পশুপালন।

আগুন কী করল? হজম প্রক্রিয়াটাকে সহজ করে দিল। মানুষ-তো কাঁচা মাংসই খেত। কাঁচা মাংস হজম করা শক্ত। কিন্তু পুড়িয়ে নিলে? মাংসের টুকরোটি মুখে পুরবার আগেই হজমের কাজটা অর্ধেক এগিয়ে থাকে।

আর, পশুপালনের ফলে কী হল? মাংস পাওয়া গেল আরও বেশি পরিমাণে। শিকারে-তো এমনও হতে পারে যে, ঘুরেফিরে কোথাও সুবিধে হল না—উপোস। কিন্তু, পশুপালনে সুবিধে হল—শিকার না জুটলে পোষা মাংস আছে। কিংবা, শিকারে যা পাওয়া গেল তার সঙ্গে কিছু পোষা মাংস মিলিয়ে বেশ ভূরিভোজন হতে পারে। আর, খাবারটাও বেশ নিয়মিত হয়।

আরও হল দুধ। আগেই বলা হয়েছে, মাংসেরই উপাদান পাওয়া যায় দুধে। পশুজগৎ থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে মানুষ—মানুষ ক্রমেই আরও বেশি মানুষ হয়ে উঠছে। এই আগুন আর পশুপালন মানুষকে মুক্তির পথে

বহুদূর এগিয়ে দিল। আমাদের অতি-আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের মূলেও-তো ঐ আগুন।

মানুষ ক্রমে সমস্ত রকমের খাদ্য খেতে শিখল। তেমনি, জল-বায়ুর যে-কোন অবস্থায় বাস করতে পারা চাই। তাও শিখতে হল। মানুষ ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর সর্বত্র। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—তা সে যেখানে যত নিষ্ঠুরই হোক-না-কেন, তারই মাঝে মানুষ বসবাস করবার ব্যবস্থা করে নিল। আর কোন প্রাণী তা পারে না। কোন-কোন গৃহপালিত পশু আর কীটপতঙ্গ অবশ্য প্রায় যে-কোন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে-তো স্বাধীনভাবে নয়—মানুষেরই সঙ্গে, মানুষের সাহায্যে।

আগেই বলা হয়েছে—প্রথম মানুষ গ'ড়ে উঠেছিল গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন-এক জায়গায়। সেই আদি বাসস্থানে ছিল একটানা গরম। এই একটানা গরম থেকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল একটু ঠাণ্ডা আবহাওয়ার খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে এমন জায়গা পাওয়া গেল যেখানে একটানা গরম নয়—ঋতুপরিবর্তন হয়; বছরটা অন্তত শীত আর গ্রীষ্মে ভাগ-করা।

নিষ্কর্মার প্রাধান্য এল

সেই নতুন দেশে আবার প্রয়োজনও দেখা দিল নতুন নতুন। শীত আর আর্দ্রতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় চাই, কাপড়-চোপড় চাই। নতুন আবহাওয়ায় শ্রমের ক্ষেত্রও নতুন, কাজও নতুন রকমের।

এমনি ক'রে মানুষ এগোল—নিম্নতর প্রাণী থেকে তার পার্থক্য আরও বেশি, আর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

হাত, কথা বলবার শক্তি, আর মস্তিষ্ক—কাজের ভেতর এই তিন চলে একই সঙ্গে। এই তিনের সহযোগিতা না হলে কাজ চলে না। হাত-তো চাই-ই—দেহের প্রধান কর্মকর্তা সে। একত্রে অনেকে কাজ করতে হলে কিছু-না-কিছু বলতেই হবে। আর মস্তিষ্ক-তো দেহপরিবারের সভাপতি—সমস্ত আদেশ-নির্দেশ আসবে মস্তিষ্ক থেকে ; তবেই-তো চোখে দেখে, কানে শুনে, বুঝেসুঝে হাতের কাজ চলে।

এই-যে তিনের কাজ চলল মিলেমিশে, এতে মানুষের কাজ করবার শক্তিও গেল বেড়ে ; প্রত্যেকটি মানুষের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি হল। আবার, সমাজে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভেতর থেকে আরও বেশি জটিল কাজ করবার শক্তিও বেড়ে গেল। আরও বড়, আরও জটিল কাজ করবার সুযোগ, সম্ভাবনা ও শক্তিও বেড়ে গেল। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে শ্রমের প্রকৃতিও বদলাতে লাগল। কত দিকে কত রকমের কাজ। সে-সব কাজ করবার ধরনও অনেক উন্নত হয়ে উঠল। অবশ্য, কোন-কোন যুগে পুরুষের পর পুরুষ ধ'রে কোন উন্নতিই হয়নি। এমনও হয়েছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও মোটের ওপর বিকাশের পথে, উন্নতির পথেই চলেছে।

কীভাবে কোন্ পথে সে-উন্নতি চলল তা আমাদের এখনকার আলোচনার বিষয় নয়। আমরা জানি, শিকার আর পশুপালনের সঙ্গে ক্রমে যোগ হয়েছে কৃষি, সুতোকাটা, তাঁতবোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প অর্থাৎ কুমোরের কাজ, জলপথে যাতায়াত। এ-সবই মানুষ করতে পেরেছে প্রয়োজনের তাগিদে। নতুন নতুন অবস্থায় প্রয়োজনও এসেছে নতুন। আবার, ততক্ষণে নতুন ও উন্নত ধরনের কাজ করবার ক্ষমতাও তার হয়েছে—সেও জানি, হয়েছে শ্রমের ভেতর দিয়ে।

জলপথে যাতায়াতের ভেতর দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন বেড়েই চলল। এবং সেই উন্নতির পথে শেষপর্যন্ত এল মানুষের শিল্পকলা, বিজ্ঞান। জীবনধারণের উপকরণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন এসেছে। আদিম গোষ্ঠীগুলি থেকে ক্রমে জাতি ও রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠল। এল আইনকানুন, রাজনীতি। মানুষের চারিপাশে এই-যে সব নতুন নতুন জিনিস গ'ড়ে উঠল—এই-যে নতুন সমাজব্যবস্থা আর তার নানা আঙ্গিক, পারিপার্শ্বিক—এ সবকিছুর একটা প্রতিফলন হয় মানুষের মনের আয়নায়। এই রকমেরই একটা অলীক অদ্ভুত প্রতিফলন হল মানুষের ধর্ম। তখন মানুষের সমাজ অনেক পেছনে ছিল।

কাজ-না-করা মানুষ

আগের দু' প্যারাতে যা-কিছু বলা হল, তার বিশদ আলোচনার জন্যে আলাদা বই লেখা দরকার। এখানে শুধু একবার ব'লে দেওয়া গেল মাত্র। মানুষের শ্রম আর মস্তিষ্কের বিকাশের পথেই এইসব কিছু সম্ভব হয়েছে। শ্রমের সংগঠন ও প্রকৃতি যেমন-যেমন বদলেছে, সমাজের গড়নও তেমনিভাবে বদলেছে—এবং, মানুষও বদলে গেছে সেই সঙ্গে : মানুষের চিন্তাশক্তি, চিন্তার ধারা, চিন্তার প্রকৃতিও বদলে গেছে।

কিন্তু, এই-যে সব নতুন সৃষ্টি—শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইনকানুন,

রাজনীতি, জাতি, রাষ্ট্র, ধর্ম—এইসবই ক্রমে মানুষের মনটাকে একেবারে জুড়ে বসল। শ্রমের দ্বারা, শ্রমের প্রক্রিয়ার ভেতর থেকেই-তো এ-সব সৃষ্টি হল। কিন্তু, একবার সৃষ্টি হয়ে গেলে এর প্রত্যেকটির ওপর অন্যটির প্রভাব পড়তে লাগল। এবং, ক্রমেই খুব জটিল পথে চলল এদের বিকাশ। শ্রম ও উৎপাদনপদ্ধতির প্রভাব আগে পড়ত সোজাসুজি। এখনও পড়ে। কিন্তু, ওই জটিল পথ ঘুরে আসার ফলে, সে-প্রভাবটি আর স্পষ্ট দেখা যায় না। তারই ফলে, ক্রমে মনে হয়, এ সব বুঝি নিছক মনেরই ফসল, মনের "স্বাধীন" সৃষ্টি। সেই মনোভাব যখন দেখা দিল, তখন শিল্প-দর্শন-সাহিত্য-কলা-ধর্ম-রাজনীতির কৌলিন্যের ফলে বেচারা হাতের কাজগুলি অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আবার কিছু লোক গজিয়ে উঠল—কাজকর্ম কিভাবে চলবে-না-চলবে তা তারা ঠিক ক'রে দিত, কিন্তু নিজেরা কাজ করত না; কাজ করিয়ে নিত অন্যকে দিয়ে। সমাজে যে-পারিবারিক সংগঠন আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, তা গ'ড়ে উঠতেও অনেক কাল কেটে গিয়েছিল। এই পরিবার পুরাপুরি গ'ড়ে উঠবার আগেই ঐ মানুষগুলি গজিয়ে উঠেছিল—যারা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। তারাই মাথা খাটিয়ে কাজের ধরন-ধারন বিলি-ব্যবস্থা সব ঠিক করত।

মূল সত্যটা তলিয়ে গেল

এইভাবে কাজ চলবার ফলে ক্রমে মানুষের মনে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হল যে, সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির মূলে যেন রয়েছে মানুষের মন। মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে এবং সেই মস্তিষ্ক খাটিয়েই যেন সবকিছু সম্ভব হয়েছে। মস্তিষ্কের বিকাশ না হলে সমাজের প্রগতি হত না, সভ্যতা গড়ে উঠত না, ঠিক কথা। কিন্তু, মস্তিষ্ক ও মনের সৃষ্টি ও গড়ন, মনের গতি ও প্রকৃতি, এ

সবই-যে শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তা তারা আর দেখল না, তা তারা অস্বীকারই করল। তারা বলল, এ সবই নিছক মনের সৃষ্টি।

সে কী রকম? যেমন ধরা যাক, নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম: অমুক কাজটা আমি করলাম কেন? তারা তার জবাব দিল: আমার চিন্তা আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে—আমার মন বলেছে, তাই করলাম। এই রকমই হয়ে উঠল চলতি ধারণা। কিন্তু, আসলে ব্যাপারটা কি? কিছু করা কিংবা না-করার মূল তাগিদটা-তো আসে প্রয়োজনের থেকে, সেটা মস্তিষ্কের বাইরেকার বস্তু। আর, সেই প্রয়োজনের তাগিদটা গিয়ে ফুটে ওঠে মনে। মনের চিন্তা ও চেতনাকে খুচিয়ে তোলে সেই প্রয়োজনের তাগিদ। এই মূল সত্যটা তলিয়ে গেল। মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের বাইরে বাস্তব জীবনে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে, বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে, নানা বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে—এ সবকিছুই হয়ে দাঁড়াল পরের কথা, গৌণ। মানুষের চিন্তা, মানুষের মনই হয়ে উঠল মুখ্য, প্রধান, গোড়ার কথা।

এবং, এই ধারণা নিয়েই মানুষ সবকিছু বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। দৈনন্দিন জীবন, রাজনীতি-দর্শন, বহিঃপ্রকৃতির ঘটনাবলী—এ সবকিছুকেই মানুষ ক্রমে এইভাবে দেখতে লাগল। মানুষের ভাব-ভাবনাই হল মুখ্য, গোড়ার কথা—এই ধারণাই এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে। তাই, একে বলা হয় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী বা ভাববাদী দর্শন। সেই প্রাচীনকালের অবস্থা-ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবার পর থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের মনকে আরও আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। এই ধারণাই মানুষের মনে প্রবল হয়ে উঠল। এবং, এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী আজও অনেক মানুষের মনকে শাসন করছে।

এই ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব কী প্রবল, তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ডারুইন আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণীজগতে ক্রমবিকাশের পথে মানুষ গড়ে উঠল। সেই ডারুইনের মতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনও এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আচ্ছন্ন। অথচ, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী আর প্রয়োজনের

তাঁগিদের গুরুত্ব-যে কতখানি, তা দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই। এর থেকেই বোঝা যায় যে, বাস্তব পৃথিবীর গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা বেশ সচেতন ছিলেন। এঁরাও মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ঠিক করতে পারেননি। তার কারণ হল ঐ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী। মানুষের উৎপত্তির মূলে শ্রমের গুরুত্ব-যে কতখানি, তা তাঁরা দেখতে পাননি, ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, শ্রমই বিধাতা।

মানুষ বড় কিসে ?

আগেই বলা হয়েছে—মানুষ তার কাজকর্ম দিয়ে বহিঃপ্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায়। অন্যান্য প্রাণীও তা করে। কিন্তু মানুষেব মতো নয়। এই-যে পরিবর্তন ঘটে বহিঃপ্রকৃতির রাজ্যে—এই পরিবর্তনের পাল্টা প্রভাব পড়ে মানুষের ওপর, কিংবা অন্যান্য প্রাণীর ওপর, অর্থাৎ যে সেই পরিবর্তন ঘটায় তার ওপর। কারণ কি ? এর মূলে রয়েছে সেই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের নিয়ম বা পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম। কোথাও কিছুই-তো স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। সবকিছুই আর সবকিছুর ওপর কিছু-না-কিছু প্রভাব বিস্তার করে—কখনও সোজাসুজি, কখনও-বা জটিল ঘুরপথে। কোনকিছুই বাদ যায় না এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে। এই-যে পারস্পরিক সম্পর্ক, এর-যে বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতি—এই জিনিসটিই আমাদের অনেক বিজ্ঞানী ভুলে যান। তাই, অনেক সময় অতি স্পষ্ট ও সাধারণ জিনিস তাঁদের চোখে ধরা পড়ে না।

অন্যান্য প্রাণী বহির্জগতে যে-পরিবর্তন ঘটায়, তা কিন্তু ভেবেচিন্তে নয়। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। বহু প্রাচীনকালে কিছু মানুষ গিয়ে বাস করেছিল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। তাদের সঙ্গে ছিল ছাগল। সেই ছাগলরা দ্বীপের পুরনো কালের ঝোঁপঝাড়, ঘাস-তৃণ সব খেয়ে নিল। এরপর ঐ দ্বীপে যে-সব নাবিক আর নতুন নতুন লোক বসবাস করতে এল, তাদের খুব সুবিধে হয়ে গেল। তারা নতুন নতুন গাছপালা লাগাতে পারল। পুরনো সেই ঝোঁপঝাড় আর ঘাস-তৃণ থাকলে নতুন কোন গাছপালা জন্মাত না। সেই ছাগলদের মাথায় কিন্তু কোন মতলবও ছিল না, পরিকল্পনাও ছিল না—যা পেয়েছে খেয়ে গেছে। ছাগলদের পক্ষে এ যেন একটা দৈবের ব্যাপার।

দৈবে নয়—ভেবেচিন্তে

কিন্তু মানুষ ? মানুষের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। মানুষ ক্রমেই অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক হয়ে উঠেছে। শরীরের গঠনে, বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষ কী ক'রে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত হয়ে উঠল, তা-তো আগেই দেখানো হয়েছে। তারই ফলে, বহির্জগতের ওপর মানুষের প্রভাবও ক্রমেই স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে ওঠে। মানুষের অভিজ্ঞতা বেড়েছে ; তার চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়েছে। মানুষ তাই আগে থেকে ভেবে-চিন্তে জেনে-বুঝে, ভবিষ্যত ভেবে কাজ করতে পারে। এবং এই ক্ষমতা তার বেড়েই চলে। ছাগল-তো পেয়েছে, আর খেয়ে গেছে। তার ফলাফল হতে পারে, তা ঘৃণাক্ষরে জানাও তার পক্ষে সম্ভব নয়—সে মস্তিষ্কই তার নেই।

মানুষ কিন্তু বন-বাদাড় আর আগাছা-পরগাছা নষ্ট করে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই মাটিতে ধান, গম, ইত্যাদি ফসল ফলাবার জন্যে, কিংবা গাছপালা, শাকসবজি, আঙ্গুরলতা, ইত্যাদি লাগাবার জন্যে। কত বীজ ছড়ালে কী পরিমাণ শস্য পাওয়া যেতে পারে, কিংবা একটা চারা লাগালে তার থেকে যত ফল পাওয়া যেতে পারে—মানুষ-তো তাও ভেবে নেয়।

আবার, এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যাচ্ছে গাছপালা, জীবজন্তু। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে নিয়ে যাচ্ছে। এমনি আমদানি-রপ্তানি ক'রে মানুষ গোটা দেশ কিংবা মহাদেশেরই গাছপালা জীবজন্তুর রকম বদলে দেয়। এ-তো প্রাচীনকালেই ঘটেছে। এইখানেই শেষ নয়। চাষ-আবাদ আর পশুপালনের ভেতর দিয়ে মানুষের হাতে প'ড়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে আরও বড় পরিবর্তন ঘ'টে গেল।

সে কী রকম ?

এক দেশের গাছপালা, জীবজন্তু আরেক দেশে নিয়ে যাওয়া-তো আছেই। আবার, গাছপালা ও জীবজন্তুর আকৃতি-প্রকৃতিই বদলে যায়। সেটা হয় নানা রকমের কৌশলী সংমিশ্রণের ফলে এবং অন্যান্য কারণে। এক জাতের

গাছপালা কিংবা জীবজন্তুকে অন্য জাতের সঙ্গে মিশিয়ে নতুন রকমের গাছপালা-জীবজন্তু পাওয়া যায়। যে-জাত থেকে গোড়ায় সুরু হয়, তার সঙ্গে আর কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের এই এখনকার ধান, গম—এ-তো গোড়ায় ছিল না। অন্য রকমের বুনো ঘাস থেকেই এর উৎপত্তি। সেই মূল উদ্ভিদ-তো এখন খুঁজে পাওয়াই দায়। তার জন্যে বিজ্ঞানীদের কতই-না বেগ পেতে হয়েছে। বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর আধুনিক কালে তার হদিশ পাওয়া গেছে। তাও আবার প্রত্যেকটি শস্যের খোঁজ পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে, তারও প্রত্যেকটির

এই ঘোড়া গোড়ায় ছিল না

গোড়ায় ছিল ফক্স-টেরিয়ারের মতো ছোট। তার সামনের পায়ে ছিল চারটে আঙুল। আরও অনেক পরে হল আরেকটু বড়—মেষপালকের কুকুরের মতো। তার পায়ে তিনটে আঙুল। এখনকার ঘোড়া তারচেয়ে অনেক বড়; আঙুল একটি মাত্র।

বেলায় একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি। আজকালকার যে-কুকুর, তারও পূর্বপুরুষ কোন এক বুনো জন্তু। কিন্তু, এত রকমের কুকুর দেখতে পাওয়া যায় যে, আজও এদের সেই পূর্বপুরুষটির সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। ঘোড়ার বেলায়ও ঠিক তাই।

এমনই সব পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের হাতে প'ড়ে। কোন-কোন ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যান্য কারণও রয়েছে।

এই ভেবে-চিন্তে কাজ করবার ক্ষমতা অন্যান্য প্রাণীদের-যে একেবারেই নেই, তা নয়। আছে—কিন্তু সে একটু বিশেষ রকমের। মানুষের মতো-তো নয়ই।

একদিনে হয়নি

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাস্‌ম—আধা-বাঙলায় বলা যায় জীবন্ত প্রোটিন—সেই প্রোটোপ্লাস্‌মই জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মূল জীবিত অংশ। নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এই প্রোটোপ্লাস্‌ম। বাইরের শক্তির প্রভাবে এই প্রোটোপ্লাস্‌ম নানা কাজকর্ম করে। সে-সব কাজকর্ম হয়ত খুবই সহজ ও সরল। অত্যন্ত সাদাসিধে যে স্নায়ু-কোষ, তাও যেখানে গ'ড়ে ওঠেনি, সেখানেও প্রোটোপ্লাস্‌মের এই রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘ'টে থাকে। কীটভুক্‌ উদ্ভিদ-যে শিকার ধরে—সে অনেকটা এই রকমেরই ব্যাপার। মনে হয় যেন রীতিমত মতলব নিয়ে আঁটঘাট বেঁধে তারা এই শিকার ধরবার জন্যে তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু, আসলে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। তাদের-তো চেতনাই নেই! মতলব কিংবা পরিকল্পনা আসবে কোথা থেকে?

এ-তো গেল উদ্ভিদজগতের কথা। প্রাণীজগতে কিন্তু ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা দেখা যায়। স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা বেড়ে যায়। স্তন্যপায়ী জীবদের ভেতর সে-ক্ষমতা বেশ উঁচু স্তরেই

দেখা যায়। বন-জঙ্গলের বাঘ-শেয়ালের বেলায় যেমনটি আছে। তারা কেমন কৌশলে পালিয়ে যায়। মানুষের তাড়া খেলে তারা ঝোঁপঝাড়-আড়আড়াল দেখে-বুঝে আত্মগোপন করতে জানে। কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে পালাতে হবে, তাও তারা বেশ বোঝে। গৃহপালিত পশুরা-তো মানুষের সংস্পর্শে আরও উন্নত হয়ে ওঠে। এইসব গৃহপালিত পশুর ভেতর প্রতিদিনই কতসব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকটা মানুষের শিশুর মতোই।

তার কারণ কী ?

প্রাণীজগতে কোটি-কোটি বছরের বিকাশের ধারার যে-ইতিহাস, সেইখানেই খুঁজতে হবে এর কারণ। সেই ইতিহাসের মাঝেই এর কারণ পাওয়া যায়। বানরজাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে যেমন মানুষের সৃষ্টি হল—আমাদের সেই পূর্বপুরুষেরাও আবার আরও নিচু স্তরের প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। এমনি ক'রে যদি পিছে চলা যায়—কোটি কোটি বছরের অতীত ইহিহাসের সূত্র ধ'রে গিয়ে তবে অতি নিচু স্তরের কীট-পতঙ্গ।

সেই কীট-পতঙ্গ থেকেও আরও পেছনে যাওয়া গেছে। আরও পেছনে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে প্রাণীজগতের বিকাশের গোড়ার কথা। জীবন সৃষ্টি হল কী করে ?—নিষ্প্রাণ জড় বস্তু থেকেই। জীবন সৃষ্টির সেই বিরাট ইতিহাস অবশ্য এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

সে যা-ই হোক—ঐ কীট-পতঙ্গ থেকে ব'য়ে এসেছে বিকাশের ধারা, কোটি-কোটি বছরের বিকাশের ধারা। আমাদের কত শত পূর্বপুরুষের দৈহিক বিকাশ ঘটেছে তারই ভেতর দিয়ে। এবং তারই থেকে শেষপর্যন্ত গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের সেই গেছো পূর্বপুরুষ।

এই-যে কোটি-কোটি বছরের বিকাশের ধারা, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বিকাশে। মানুষের যে-শিশু, সুন্দর মানুষের দেহটি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়—মাতৃগর্ভে তার গঠন সুরু হয় একটিমাত্র জীবকোষ থেকে।

সেই একটিমাত্র কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ শিশুটি গ'ড়ে ওঠে। ঐ কোটি-কোটি বছরের বিকাশের প্রত্যেকটি স্তর তাকে পেরিয়ে আসতে হয় মাত্র দশ মাস দশ দিনে।
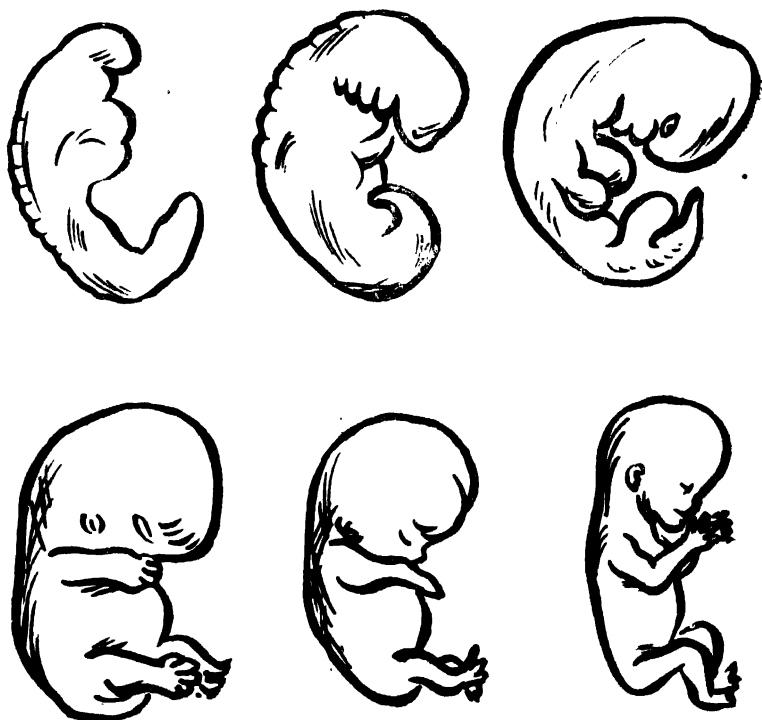
মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের বিকাশ

একেবারে গোড়ার দিকে মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের সঙ্গে মাছের ভ্রূণের অনেক মিল আছে। দুই-তিন সপ্তাহে পরিবর্তন ঘটে। মাছের সঙ্গে মিল আর থাকে না।

আমাদের হৃৎপিণ্ডে (হার্ট-এ) চারিটি খোপ আছে। কিন্তু, মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় প্রথমে মাছের মতো মাত্র দুটি, এবং পরে সরিসৃপের মতো তিনটি খোপ হয়।

এই আমাদেরও লেজ ছিল। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পঞ্চম সপ্তাহে প্রত্যেকটি মানুষের ভ্রূণ মোটামুটি ১/৩ ইঞ্চি লম্বা থাকে, এবং তার ১/৬ অংশ লম্বা লেজ থাকে। সাধারণতঃ,

অষ্টম সপ্তাহের মধ্যে লেজ লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু, লেজের সঙ্গে যেসব হাড়, পেশী ও স্নায়ু থাকে, তার কিছু কিছু আমাদের সবারই আছে।

আমাদের সবারই এক সময়ে মোটা মোটা রেশমী মতো চুল ছিল। একেবারে সারা-গা ঢাকা ছিল সেই চুলে। সে-ও ছিল মাতৃগর্ভে সপ্তম মাসে। জন্মের ঠিক আগে কিংবা সামান্য পরেই তা মিলিয়ে যায়।

এমনি আরও নানা রূপ বদল ক'রে তবে মানুষের শিশুটি।

এই-যে মাছ, সরিসৃপ, লোমশ জন্তু, লেজওয়ালা প্রাণী ইত্যাদি রূপ আমরা মাতৃগর্ভে ধারণ করে এসেছি, এর থেকে একটি জিনিস বোঝা যাচ্ছে। এই সব প্রাণীরই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে—সবার পূর্বপুরুষ একই।

এ হল দৈহিক বিকাশের কথা। তার মানসিক বিকাশের বেলায়ও অনেকটা ঐ রকমই ঘটে। কোটি-কোটি বছরের প্রত্যেকটি স্তর হয়ত নয় মানসিক বিকাশের বেলায়। কিন্তু শেষের দিককার পূর্বপুরুষদের মানসিক বিকাশের স্তরগুলি শিশুকে পেরিয়ে আসতে হয়। মানসিক বিকাশের বেলায় ঐ দীর্ঘ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে আরও সংক্ষিপ্ত সময়ে। মানুষের সংসর্গে গৃহপালিত পশুদের ভেতর যেমন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, মানুষের শিশুর সঙ্গে তার তুলনা করা যেতে পারে।

তাই আমরা বলছিলাম, পশুদের ভেতরও ভেবেচিন্তে বুঝেসুঝে কাজ করবার ক্ষমতা আছে। তাই দেখাতে গিয়ে ঐ কোটি-কোটি বছরের ইতিহাসের কথাটা একবার এসে পড়ল।

কিন্তু, মনে রাখতে হবে, পশুদের এই ভেবেচিন্তে কাজ করবার ক্ষমতা কিন্তু মানুষের মতো নয় মোটেই।

মানুষ—কী গর্বের এই নাম !

প্রকৃতির রাজ্যে অনেক কিছুই ছড়ানো আছে। পশুরা তারই কিছু কিছু যেমন আছে তেমনিভাবেই কাজে লাগিয়ে নেয়। তার ফলে প্রকৃতির রাজ্যে পরিবর্তন ঘটে। যেমন, ছাগলরা ঘাস খেয়ে নিল বলেই-তো অন্য গাছপালা জন্মাবার মাটি তৈরি হল। পশু খেয়েদেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারই ফলে এইসব পরিবর্তন ঘটে যায়। পশুর নিজস্ব ইচ্ছা বা পরিকল্পনার ফলে এ পরিবর্তন ঘটছে না।

সে হয় মানুষের বেলায়। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে পরিবর্তন ঘটায় জেনে-বুঝে, রীতিমতো পরিকল্পনা অনুযায়ী—সে-পরিবর্তন যাতে কাজে আসতে পারে। এমনি ক'রে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মূল পার্থক্য হল এইখানেই। এবং এখানেও সেই শ্রম। শ্রমই সৃষ্টি করেছে এই পার্থক্য।

প্রকৃতির ওপর মানুষের এই-যে বিজয়, এ মানুষের আনন্দ করবার বিষয়, গর্ব করবার জিনিস। কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেলে ভুল হবে। এর প্রত্যেকটি বিজয়ের জন্যে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ একটাকিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। সে-উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু, তার ফলে ক্রমে আরও নানা ফল দেখা দিয়েছে। যা মানুষ আগে ভাবতেও পারেনি। এমনও হয়েছে যে, শেষপর্যন্ত গোড়াকার সুফলটিই নষ্ট হয়ে গেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বহু পূর্বকালে মেসপটেমিয়া, গ্রীস, এশিয়া মাইনর এবং অন্যান্য জায়গায় যারা কাজ করত, তারা জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করেছিল চাষ-আবাদ করবার জন্যে। চাষ-আবাদ হল। কিন্তু জঙ্গল ছিল

ওইসব অঞ্চলে জমির আর্দ্রতা সৃষ্টি করবার জন্যে রসের যোগানদার। এবং, জঙ্গল উজাড় হবার ফলে জমি ক্রমে অনুর্বর হয়ে উঠল। এমনই প্রকৃতির প্রতিশোধ।

প্রকৃতির ওপর মানুষের যে-প্রভুত্ব, সে কিন্তু বিদেশীর ওপর বিজেতার প্রভুত্বের মতো নয়। যেমন, আমাদের দেশের ওপর সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব। আমাদের দেশের, আমাদের জাতির তারা কেউ নয়—তারা বাইরেকার, বাইরে থেকেই নানা কৌশলে দেশী শাসক-শোষকদের মারফৎ তারা প্রভুত্ব চালায়। প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভুত্ব তেমন নয়। প্রকৃতির বা'র নয় মানুষ। আমরা এই রক্ত-মাংস-মস্তিষ্কওয়ালা মানুষ, আমরা প্রকৃতিরই অংশ, প্রকৃতির মাঝেই আমাদের অস্তিত্ব।

এই প্রকৃতির ওপর আমাদের প্রভুত্বটা তাহলে কী রকমের? সে হচ্ছে এই যে, এই প্রকৃতির নিয়মাবলী জেনে-বুঝে সেগুলিকে ঠিকঠাক প্রয়োগ করবার ক্ষমতা। সে-ক্ষমতা অন্য কোন প্রাণীর নেই।

মানুষ আরও মানুষ হবে

প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তার ফলে কী হচ্ছে? আগে প্রকৃতির রাজ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে গেলে তার আশু ফলটুকু বুঝেই তা করা হত। তার বেশি জ্ঞান ছিল না। তারপরও কী হতে পারে না-পারে, তা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। এখন প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে। জ্ঞান ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিশেষ ক'রে কল-কারখানায়, ক্ষেত-খামারে উৎপাদনের ব্যাপারে এই ভবিষ্যত বুঝবার ক্ষমতা আরও বেশি, আরও স্বচ্ছ। উনিশ ও বিশ শতকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-অগ্রগতি হয়েছে, তার ফলে এই জ্ঞানের ব্যাপকতা আর স্বচ্ছতাও বেড়ে গেছে! এবং বেড়েই চলেছে। এই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে কী ঘটেছে? প্রকৃতির থেকে মানুষের যে-বিচ্ছেদ, তা ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে। বিদেশী বিজেতার ভাবটা ক্রমেই ক'মে যাবে মানুষের মন থেকে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে-বিরোধ গ'ড়ে উঠেছে, তা মিটে যাবে ক্রমেই। মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অংশ হিসেবে ভাবতে শিখবে। এবং, বুঝতেও শিখবে যে, বিচ্ছেদটা, দ্বন্দ্বটা কৃত্রিম, অস্বাভাবিক। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঐক্য গ'ড়ে উঠবে এমনি ক'রে।

আবার,—মন আর বস্তু, এবং দেহ আর আত্মার ভেতর যে-বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভাব আছে মানুষের মনে, তাও এমনি করে ঘুচে যাবে। সনাতন ধর্মে—হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্ট সব ধর্মেই—মানুষ আর প্রকৃতি এবং বস্তু আর মনের ভেতর কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখা হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজের ভেতর দিয়ে তা ঘুচে যাবে।

উৎপাদনের উদ্দেশ্যে আমরা যা-কিছু করি, তার প্রাকৃতিক ফলাফল কী হবে, তা আমরা অনেকটা জানি। অর্থাৎ, প্রকৃতির রাজ্যে তার ফলে কী হতে পারে-না-পারে, তা আমরা অনেক দূর-ভবিষ্যত অবধি বুঝতে পারি। এবং, এইটুকুর জন্যেই মানুষের হাজার-হাজার বছরের শ্রম এবং সেই শ্রমের শিক্ষা লেগেছে। প্রাকৃতিক ফলাফলটা অনেকটা জানা আছে। এর সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে অতটা জ্ঞান লাভ করা আরও ঢের শক্ত।

সে কী রকম? তাই এবার বলা হবে।

তারা ভাবতেও পারেনি

ক্ষেত-খামারে ধান, গম, ইত্যাদি, আর কল-কারখানায় নানা পণ্য উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু, এমনই সে-সব কিছুর বিলিব্যবস্থা যে, লক্ষ লক্ষ মানুষ একবেলা ডাল-ভাতেরও সংস্থান করতে না পেরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। পথে-পথে ফুটপাথে তাদের মৃতদেহ আবহাওয়াকে পর্যন্ত বিষিয়ে তোলে; যারা বেঁচে থাকে তাদেরও স্বাস্থ্য বিপন্ন ক'রে তোলে। পঞ্চাশের

মন্বন্তর-তো ভুলবার নয়। উৎপন্ন জিনিস এখন বিলি হয় মুষ্টিমেয় মালিকদের লাভের দিকে নজর রেখে। কিন্তু, এমনই হয় তার বিষময় সামাজিক ফল

একটু অন্য রকমের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মদ চোলাই করতে শিখেছিল সবার আগে আরবরাই। আমেরিকা দেশটাই আবিষ্কার হয়নি তখনও। কিন্তু সেই মদ শেষপর্যন্ত সেই মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের সর্বনাশ ঘটাল। মদ চোলাই করবার সময় আরবরা নিশ্চয়ই ভাবতেও পারেনি, এমনটি হবে।

আরও একটি উদাহরণ। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তার অনেক আগেই ইওরোপে ক্রীতদাসপ্রথা উঠে গিয়েছিল। কিন্তু, আমেরিকা আবিষ্কারের পর ক্রীতদাসপ্রথা আবার বেঁচে উঠল। আমেরিকার নিগ্রোদের নিয়ে কেনা-বেচা আরম্ভ হল। কলম্বস কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন?

আরও উদাহরণ। যে-যন্ত্র দুনিয়ায় যুগান্তর আনল: বাষ্পীয় ইঞ্জিন। সতের-আঠার শতকে এই যন্ত্র আবিষ্কার হয়। খনির শ্রমিক থেকে লর্ড পরিবারের বিদ্বান পর্যন্ত বহু লোকের চেষ্টা, আর কয়লাখনির জল তুলবার প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার হয়েছিল এই বাষ্পীয় ইঞ্জিন। কল-কারখানায় উৎপাদনে এক মহাবিপ্লব ঘ'টে গেল এই যন্ত্রের সাহায্যে। এবং ক্রমে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে প্রচুর বিত্ত-সম্পদ জমা হয়ে গেল। অধিকাংশ মানুষ হয়ে গেল বিষয়সম্পত্তিহীন। ঐ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের শক্তি দিয়েই ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণী সমাজে আর রাজনীতিতে প্রধান হয়ে উঠল। কিন্তু, তারপর ঐ যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের ফলে কী হল? ছোটখাট যারা ছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারল না। অধিকাংশ উৎপাদনের ব্যবস্থা অল্প কয়েকজনের হাতে পড়ল, যারা ঐ যন্ত্রের মালিক।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ওপর শোষণও বেড়ে চলল। আবার, শ্রমিকরাও আগে ছিল এখানে-সেখানে ছড়ানো নানা অবস্থায়। এখন তারা একটা আলাদা শ্রেণী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। সুরু হল এক নতুন শ্রেণী-সংগ্রাম: ধনিক আর

শ্রমিকশ্রেণীর ভেতর লড়াই। প্রচণ্ড সংগ্রাম—বহু দীর্ঘ তার ইতিহাস। সেই শ্রেণীসংগ্রামের পথেই দুনিয়ার এক-ষষ্ঠাংশে শ্রমিক আর কৃষিজীবীর সোবিয়েৎ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। ধনিক শ্রেণীকে লোপ ক'রে দেওয়া হল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পর আরও কত শত যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সবের মালিক আর মুষ্টিমেয় ধনী নয়। তার মালিক হল প্রত্যেকে—যাকে বলে সামাজিক মালিকানা। সেখানে আজ আর প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো শ্রেণী নেই। কাজেই শ্রেণীবিরোধ আর শ্রেণীসংগ্রামও নেই। শ্রেণীসংগ্রামের পথেই চিরতরে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান। এবং, সারা দুনিয়া এগিয়ে চলেছে সেই পথেই।

এর কিছুই কি ভাবতে পেরেছিলেন সেই আঠের শতকের আবিষ্কর্তারা? তা পারেননি; তা পারা তখন সম্ভবও ছিল না।

উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক ফলাফল এমনই সুদূরপ্রসারী হয়। এবং, আগের কালের মানুষের দৃষ্টি এতদূর পৌঁছয়নি। যদিও, বাষ্পীয় ইঞ্জিনে প্রাকৃতিক ফলাফল তাঁরা জানতেন। কিন্তু, বহু অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মানুষ এসেছে। বহু দুঃখ-কষ্ট-বেদনা মানুষকে সহ্য করতে হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা পাবার জন্যে। এবং তারই ভেতর থেকে মানুষ নতুন করে ভাবতে শিখেছে। ইতিহাসের নানা ঘটনা, নানা শক্তির লড়াইয়ের ফলাফল—এই সব তথ্য সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে বিজ্ঞানীর মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে বিচার করতে শিখেছে মানুষ। এবং, ক্রমে উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক ফলাফল সম্পর্কেও মানুষ স্পষ্ট ধারণা লাভ করল।

এরও একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে সুরু ক'রে নতুন শ্রেণীসংগ্রাম সুরু হল, সেই শ্রেণীসংগ্রামের পথে মানুষের সমাজে কত পরিবর্তন এল। এ সবই, একেবারে আজ অবধিকার কথা, একেবারে নির্ভুল-ভাবে বলে গেছেন কার্ল মার্কস্ আর ফিড্‌রিশ এঙ্গেল্‌স। একশ বছর আগে, 'কম্যুনিস্ট ঘোষণাপত্র' নামে বইয়ে। শুধু আজ অবধি নয়। সারা দুনিয়ায়

একদিন সোবিয়েৎ দেশের মত ব্যবস্থা হবে, কম্যুনিস্ট দুনিয়া গড়ে উঠবে—তখনকার সমাজের চেহারা কী রকম হতে পারে, সে সম্পর্কেও মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স ভবিষ্যদ্‌বাণী করে গেছেন। জ্যোতিষীর বুজ রুকি নয়,—এ হল বিজ্ঞানীর দৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা যেমন আবহাওয়ার হালচাল আগে থেকেই বলে দিতে পারেন। তেমনি করে, ইতিহাসের নানা তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। প্রকৃতির জীবনে যেমন-সব বিজ্ঞান আছে—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইত্যাদি, তেমনি সমাজবিজ্ঞানও আজ সঠিক বিজ্ঞানের মর্যাদা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্যক্ষেত্রে এর পরীক্ষা হয়ে গেছে।

এই-যে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ফলাফল, সেগুলি আগে মানুষের অজ্ঞাতেই ঘটে যেত। আজ অন্তত একটি দেশে সেগুলিকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে। শুধু একটি দেশেই নয়,—ইওরোপের নতুন-গণতন্ত্রী দেশগুলিতেও। মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী, মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে ভালোর জন্যেই সেগুলিকে নিয়োগ করা যাচ্ছে। এবং, অন্যান্য দেশেও প্রগতির শক্তি অমনি স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

কিন্তু, শুধু জ্ঞান থাকলেই হয় না। সামাজিক ফলাফল ইচ্ছানুযায়ী ঘটাতে হলে শুধু জ্ঞান থাকাটাই যথেষ্ট নয়। আরও কিছু চাই। যে-ব্যবস্থায় ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় উৎপাদন চলেছে, সেই ব্যবস্থাটাই বদলানো দরকার। তবেই সে-জ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব।

শ্রমের ভেতর দিয়ে নতুন নতুন যন্ত্র আসে। সে-যন্ত্রকে কাজে লাগাতে হলে শ্রমের কায়দা-কানুন এবং তার সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থাও বদলাতে হয়। যেমনটি হয়ে এসেছে আদিম কাল থেকে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারের ফলে সেদিনও যেমন হয়েছিল।

কিন্তু, তার থেকেও আরও বহুদূর এগিয়ে এসেছে শ্রমের যন্ত্র। অথচ, উৎপাদনের ব্যবস্থাটা রয়ে গেছে সেই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের গোড়ার দিককার অবস্থায়। আরও-যে উন্নত জীবন গড়ে তোলা যায়, তার পথে বাধা ওই

পুরনো ব্যবস্থা, আর পুরনো ব্যবস্থার মাঝে মানুষে-মানুষে পুরনো সম্পর্ক। পারিবারিক সম্পর্কের কথা নয়,—বলা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের কথা। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা থাকায়, মানুষে-মানুষে আজ খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক—পশুদের মত, জঙ্গলের মতো।

কিন্তু, সব মানুষের যা-কিছু প্রয়োজন তা-সব তৈরি করবার উপযুক্ত উপকরণ রয়েছে মানুষের হাতে। শ্রম ও সমাজের ক্রমবিকাশের পথে তাই নতুন বিলি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গোড়ায় যেমন হয়েছিল, এও তেমনি জীবন-ধারণের প্রয়োজন। গোড়ায় ছিল কোনমতে বাঁচবার তাগিদ ; আর আজ চাই আরও উন্নত জীবন। কিন্তু মূলে সেই একই জিনিস।

সেই তাগিদে মানুষ এগিয়ে যাবেই। মানুষে-মানুষে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। পশুজগৎ থেকে একদিক থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে মানুষ। পুরাপুরি মানুষ সৃষ্টি হবে। এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে উচ্চতর স্তরে। প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে,—হয়েছে সোবিয়েৎ দেশে। শ্রম আর মনের ফসলে সমৃদ্ধ মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে নতুন নতুন বিজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে।

মিচুরিণ জীববিজ্ঞান ঃ প্রাণের উৎপত্তি

আমাদের এই পৃথিবী। জ্যোতিষবিজ্ঞানে এর নাম হল, পৃথিবী নামে একটি গ্রহ। অনেক গ্রহর মধ্যে একটি। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অনেক গ্রহ। তারই একটি হল আমাদের এই পৃথিবী।

সূর্য নিজেই একটা তারা। অমন কোটি কোটি তারা মিলে হয় একেকটা ছায়াপথ ('মিল্কি ওয়ে')। তারই একটা ছায়াপথের উপকণ্ঠে রয়েছে আমাদের পৃথিবী।

সূর্যর মতো কোটি কোটি তারা নিয়ে-যে একেকটি ছায়াপথ, সে-ছায়াপথও আছে অসংখ্য। এবং এই সবকিছু মিলে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সুরু কোথায়? শেষ কোথায়? নেই—সুরুও নেই, শেষও নেই। কবে সুরু হল? শেষ হয়ে যাবে নাকি? তার জবাব হল: আদি নেই—অনাদি; শেষ নেই—অনন্ত। অসীম অশেষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এই অসীম-অশেষের মাঝে নিতান্ত ক্ষুদ্র আমাদের এই পৃথিবী। কিন্তু তারই মাঝে আমাদের সমস্যার অন্ত নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর মাঝে যত ক্ষুদ্রই হোক-না-কেন, এই পৃথিবী আর তার বুকে জল, পাথর, জীবজন্তু, মানুষ—অসংখ্য নিষ্প্রাণ বস্তু আর প্রাণবন্ত জীব—তারই অসংখ্য জটিল প্রশ্ন নিয়েই-তো আমাদের পণ্ডিতদের চোখে ঘুম নেই; বিভ্রান্তির অন্ত নেই আমাদের মতো কত সাধারণ মানুষের মনে। যদিও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর মাঝে নিতান্তই ক্ষুদ্র আমাদের এই পৃথিবীটা।

এই-তো যেমন সবাই আমরা দেখি, সূর্য সকালে উদয় হয় পূবে; আর সারা আকাশ পাড়ি দিয়ে বিকেলের দিকে পশ্চিমে অস্ত যায়। আজ না-হয় আমরা

সবাই ব্যাপারটা জানি। কিন্তু সে মাত্র শ'তিনেক বছর আগের কালের কথা। তখন বহু কষ্টে প্রমাণ করতে হয়েছিল। কোপারনিকাস প্রমাণ করে দিলেন, সূর্য অমন আকাশ পাড়ি দেয় না। পৃথিবীটা ঘুরছে তার অক্ষর ওপর। তাই, কখনও এর এপিঠ, কখনও ওপিঠ সূর্যমুখী হয়ে আলো পায়। আর, নিজের অক্ষর ওপর ঘুরতে ঘুরতেই পৃথিবীটা সর্বক্ষণ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। আজ কে না জানে? ভূগোল পাঠ প্রথম ভাগের প্রথম পৃষ্ঠায়ই হয়ত সব লেখা আছে।

"অসম্ভববাদের" লড়াই

কিন্তু, অত সহজ সরল ছিল না। এক সময়ে লোকে ভাবতেই পারত না। পৃথিবীটা যদি গোলই হবে, খাড়া দাঁড়িয়ে আছি কেমন করে? চলেফিরে বেড়াচ্ছি কেমন করে? পৃথিবীটা ঘুরছে? কই, মনে-তো হয় না! তবু, আজ আমরা তা বুঝি। বিজ্ঞান তা সহজ সরল করে বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেকালে এইসব কথা বলবার "অপরাধে"ই গীর্জার পুরুতরা গ্যালিলিও'র ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিল! পুড়িয়ে মেরেছিল ব্রুনোকে!

এমনি করে তারা জ্ঞানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে। লড়াই চালিয়েছে প্রগতির বিরুদ্ধে। অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছে মানুষকে।

এবং পরাজিতও হয়েছে বারবার। ভূগোলপাঠ প্রথম ভাগই তার প্রমাণ। যার জন্যে তারা বিজ্ঞানীকে পুড়িয়ে মেরেছিল, তা আজ শিশুর প্রথম পাঠের কথা।

তবু, লড়াই তারা ছাড়েনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান বেড়েছে। মানুষ এগিয়েছে। আর, তারা একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু লড়াই ছাড়েনি। একটু পিছিয়ে একটা নতুন পরিখায় দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়েছে। যেমন, আজও অনেক ভাববাদী পণ্ডিত বলেন, অমন-যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার কেন্দ্রস্থল নাকি আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবীটাই! নতুন কিছু

বলতে গেলেই তাঁরা বলেন—"অসম্ভব"! নতুন জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই তাঁরা তারস্বরে চিৎকার করে ওঠেন—"অসম্ভব!" বিজ্ঞানের এক মস্তবড় আবিষ্কার হল ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর 'কোআণ্টাম্ তত্ত্ব'। তাই দিয়েই ওই ভাববাদী অসম্ভব-বাদীরা "প্রমাণ" করতে চান যে, এর পর আর কোন জ্ঞান সম্ভব নয়! অসীম-অশেষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে "মাপজোপ" করে সীমারেখা টেনে দিতে চান তাঁরাই। কেল্‌ভিন নামে বিজ্ঞানী বললেন, ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবীটার "তাপ-মৃত্যু" ঘটবে! ঐ দলের পণ্ডিতেরাই বলেন, ক্ষেতে যে ফসল হয়, তা ক্রমে কমে আসতে বাধ্য। ঠেকাবার কোন উপায় নেই। মালথুস্ নামে ইংরেজ পুরুত বলে দিলেন যে, এই দুনিয়া থেকে দারিদ্র, বেকারসমস্যা, অনাহার দূর করা অসম্ভব। তাই, আজ ভাববাদী পণ্ডিতেরা মানুষ কমাবার উপদেশ দেন। এবং এমনি অসংখ্য কুতর্ক তুলে তাঁরা সর্বত্র সীমারেখা টেনে দিতে চান। না খেয়ে মরো; মাটির নামে অপবাদ গাও; এগিও না—গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পাবে না।

তারা মানুষের শত্রু। তাই মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানকে অসম্ভববাদের শেকলে বেঁধে রাখতে চায়।

তারাই বলে। বলে—গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ, সবই একেবারে চূড়ান্ত রূপে সৃষ্টি হয়ে আছে। ঈশ্বর নিজে হাতে সব করে রেখেছেন। ওর ওপর আর হাত দেওয়া চলবে না। সব ঠিকঠাক। অপরিবর্তনীয়। কিন্তু, আমরা-তো এই চার পা থেকে দু'পা হবার কাহিনীতেই দেখলাম, ওদের কথাটা ভুল। এখনকার গম, ঘোড়া, এসব-তো গোড়ায় ছিল না। মানুষ বলে কোনও প্রাণীও-তো ছিল না এ দুনিয়ায়। কী একরকমের ঘাস থেকে হল গম। ঘোড়ার পূর্ব-পুরুষেরা ছিল অন্য জাতের জীব। মানুষ গ'ড়ে উঠেছে এক বিশেষ রকমের বনমানুষ থেকে। এই আজও-তো সোবিয়েৎ দেশে সম্পূর্ণ নতুন জাতের সব গরু, ভেড়া, ফল, গম, তৈরি করছে। সোবিয়েৎ দেশের নতুন মানুষ নিজ হাতে সব তৈরি করছে! নতুন তাদের বিজ্ঞানও। প্রকৃতির খেয়ালখুশির

ওপর নির্ভর করে থাকে না। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থা সৃষ্টি ক'রে আরও ভাল জাতের গাছপালা, গরুভেড়া, সব সৃষ্টি করছে তারা।

অমনি সেই ভাববাদী পণ্ডিতেরা বলে উঠেছেন—"তা হতেই পারে না; অসম্ভব!" বর্তমানে এই নতুন সোবিয়েৎ জীববিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন ত্রফিম দেনিসোভিচ লাইসেঙ্কো। সেই লাইসেঙ্কো সম্পর্কে অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলি বললেন, "লোকটা একটু নামকাম চায়···ওকে বুদ্ধিজীবী বললে, ও নিজেই আপত্তি করবে সবার আগে।" স্যর হেন্‌রি ডেল বললেন: যেখানে এমনসব কাণ্ড ঘটছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলে না। হারমান মুলার নামে বিজ্ঞানী বলে দিলেন যে, সোবিয়েৎ দেশে বিজ্ঞানচর্চাই অসম্ভব। ডাঃ. সি. ডি. ডর্লিংটন লিখলেন: "পার্থক্য সহজাত—অপরিবর্তনীয়।···কোন কোন গম অন্যর থেকে ভাল, এবং তার পরিবর্তন অসম্ভব।" অথচ, লাইসেঙ্কো হাতে-কলমে সব প্রমাণ করে দিয়েছেন। শ'শ' রকমের নতুন ফল, নতুন গরু-ভেড়া, তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নতুন জাত। পুরনো বংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বংশগতিই (হেরিডিটি) বদ্‌লে গেছে। তবু ডার্লিংটন বললেন—অসম্ভব; ও অবৈজ্ঞানিক! এবং এঁরা সবাই মিলে সমস্বরে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, তার নতুন মানুষ, আর নতুন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে লাগলেন। লড়াই তারা ছাড়েনি।

অপবিজ্ঞানের "যুক্তি"

সোবিয়েৎ জীববিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তাঁদের একটা "বৈজ্ঞানিক" যুক্তিও আছে। তবে, সে-যে অপবিজ্ঞান, তা একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মেণ্ডেল আর মর্গ্যান নামে দু'জন বিজ্ঞানীর নামে এঁদের বলা হয়—মেণ্ডেল-মর্গ্যান-বাদী।

এই মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদের "যুক্তি"গুলি উপস্থিত করছি। মেণ্ডেল-মর্গ্যান-

বাদীরা বলেন, একটা বিশেষ রকমের "বংশগত পদার্থ" আছে। তা অজর, অমর। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, যা-ই জীবন্ত, তার মাঝে একটা "স্বতন্ত্র বংশগত পদার্থ" থাকে। জীবদেহেরই মাঝে; কিন্তু জীবদেহ থেকে তা "স্বাধীন"। তার ওপর প্রতিবেশের কোন প্রভাব পড়ে না। জীবদেহে কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু, ওই "বিশেষ পদার্থটিকে" সে-পরিবর্তন স্পর্শও করতে পারবে না। এই হল মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদের ফতোয়া।

কিন্তু, জীবজগতে-যে অসংখ্য পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তা তাঁরাও অস্বীকার করতে পারেন না। সবরকমের জীবজন্তু, গাছপালাই নিম্নতর রকমের জীবজন্তু আর গাছপালা থেকে গড়ে উঠেছে। সবই গোড়ায় অতি সরল ধরনের জৈব পদার্থ থেকে ক্রমে-বিকশিত হয়েছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই। লড়াইয়ে বারবার পরাজিত হয়ে এসব পরিখা তারা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ঐসব সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তবু, লড়াই ছাড়েনি। একটু পিছিয়ে নতুন পরিখায় আশ্রয় নিয়েছে।

স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। হ্যাঁ, পরিবর্তন ঘটে বটে। কিন্তু, তা ঘটে হঠাৎ, আকস্মিকভাবে। ইচ্ছামতো পরিবর্তন ঘটানো যায় না। কিন্তু, রঞ্জন-রশ্মি দিয়ে-যে সোজাসুজি পরিবর্তন ঘটানো গেছে? অস্বীকার করবার উপায় নেই। অমনি তারা নতুন পরিখায় দাঁড়িয়ে বলে: সে-পরিবর্তনকে মানুষ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। প্রয়োজনমতো, ইচ্ছামতো পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অমন একটা পরিবর্তন ঘটলে, তা-যে কোন্ দিকে যাবে, তা আগে থেকে বোঝা অসম্ভব। তবে, আকস্মিকভাবে যেসব পরিবর্তন ঘ'টে যায়, সেটা হয়তো কাজে লাগানো যেতে পারে। যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকেই। কিন্তু, সোবিয়েৎ দেশে-যে অত শত রকমের নতুন জাতের গাছপালা তৈরি করল? তবে? তখন মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীদের আর কোন "বৈজ্ঞানিক" যুক্তি নেই। তখন শুধু বলে—"অসম্ভব!"

সোবিয়েৎ বিজ্ঞান বলে—না; প্রকৃতির মর্জির ওপর নির্ভর করে থাকব

না। ছিনিয়ে নেবো। পরিবর্তন ঘটাবো প্রয়োজনমতো, ইচ্ছামতো। ফসলের প্রাচুর্য আনব। ঘুচিয়ে দেবো দারিদ্র।

ঈভান্ ব্লাদিমিরোভিচ মিচুরিন ছিলেন বিজ্ঞানজগতে এই লড়াইয়ের নেতা। আজ লাইসেঙ্কো নিয়েছেন সেই নেতৃত্ব।

কোন বাধা মানে না এই সোবিয়েৎ মিচুরিন জীববিজ্ঞান। মানুষের জ্ঞানের, মানুষের ক্ষমতার কোন সীমা নেই। "অসম্ভববাদ"কে ভেঙে চুরমার করে এগিয়ে চলে সে বিজ্ঞান। প্রকৃতির নিয়মকানুন দেখেই শেখে। আর, সেই জ্ঞান নিয়েই প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। আগে বুঝে নাও—কেন? কেন ঘটে? কিসে ঘটে পরিবর্তন? তারপর প্রয়োজনমতো পরিবর্তন ঘটাও জীবদেহে; এবং সেই সঙ্গে তার বংশগতিকেও দাও বদ্‌লে। "বংশগত পদার্থ" ব'লে কিছু নেই। ওটা হল মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদের কল্পনা। বংশগতি সমগ্র জীবদেহর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবদেহটি আবার তার প্রতিবেশেরই অংশ। "জীবদেহ আর তার জীবনের উপযোগী অবস্থা...এই দুইয়ে মিলে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য।" সেই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কর নিয়ম।

লড়াই চলেছে জীববিজ্ঞান-ক্ষেত্রে। বংশগতির রণাঙ্গনে এক ঘাঁটি করে দাঁড়িয়েছে মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা। বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞানের লড়াই। দেখা যাচ্ছে, বংশগতি ব'লে জিনিসটাকে দু'পক্ষই স্বীকার করছেন। বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা—এই নিয়ে লেগেছে লড়াই।

এই লড়াইয়ের কায়দাকানুন বুঝতে হলে, জীবদেহর মৌলিক গঠন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। সেই কথাটা আমরা এখানে আলোচনা ক'রে নেবো।

একেবারে নিম্নতম ধরনের একরকমের প্রাণযুক্ত পদার্থ আছে। তার প্রকৃতি, ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। এই নিম্নতম ধরনের জীবন্ত পদার্থ ছাড়া, যেকোন জীবদেহই 'সেল' বা কোষ দিয়ে গড়া। এক-কোষ

জীবন্ত পদার্থও আছে। কিন্তু অধিকাংশ জীবদেহই অসংখ্য কোষ দিয়ে গড়া।

কোষ জিনিষটা কি? কোষ হল প্রধানতঃ অ্যালবুমেন জাতীয় পদার্থ দিয়ে গড়া। অ্যালবুমেনটা কী? ডিমের হলদেটা, যাকে বলে কুসুম, সেই হল অ্যালবুমেনজাতীয় পদার্থ। অ্যালবুমেনজাতীয় পদার্থর মাঝে নিউক্লিঅস নামে কেন্দ্রবস্তু মিলে হল কোষ। কোষের একটি বহিরাবরণ থাকে। তাকে বলে মেম্‌ব্রেন্—বাংলায় ঝিল্লী। ঝিল্লীর মাঝে বস্তু থাকে মোটামুটি তরল অবস্থায়। নিম্নতর জীবদেহে কোষগুলি সব একই রকমের। কিন্তু উচ্চতর জীবদেহে থাকে বহু রকমের কোষ। পৃথক তাদের প্রকৃতি; পৃথক তাদের কাজকর্ম। যেমন, মানুষের দেহে যত কমের দেহবস্তু আছে—অস্থি বা হাড়, মাংস, পেশী, স্নায়ু (নার্ভ), কণ্ডুরা (টেণ্ডন), সন্ধিবন্ধনী (লিগামেণ্ট), তরুণাস্থি (কার্টিলেজ), চামড়া, ইত্যাদি—সবই হয় কোষ দিয়ে গড়া; নইলে কোষ থেকেই উৎপন্ন। কিন্তু, এক-কোষ জীবন্ত পদার্থই হোক, আর অসংখ্য কোষের জীবদেহই হোক; সব কোষ একই রকমের হোক, আর নানা রকমেরই হোক—কোষের সংখ্যা বাড়ে প্রধানতঃ একই প্রক্রিয়ায়। (বলা হল, "প্রধানতঃ"—কেননা, অন্য প্রক্রিয়ায়ও হয়। সে-কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব)। এই প্রধান প্রক্রিয়াটি হল—বিভাগ। ("বিভাগটা"ও অমন সহজ নয়। সে-কথাও পরে।) এক ভেঙে দুই, দুই থেকে চার...এমনি ক'রে চলে। কোষের নিউক্লিঅসটি প্রথমে মাঝামাঝি জায়গায় সরু হয়ে আসে—সংকুচিত হয়ে আসে। সংকুচিত অবস্থা বাড়তে থাকে এবং শেষপর্যন্ত দুটো নিউক্লিঅস হয়ে যায়। সারা কোষেও তাই ঘটে। নিউক্লিঅস দুটিকে ঘিরে কোষের সমস্ত প্রোটোপ্লাজ্‌ম দুভাগে জমে ওঠে। দুভাগের মাঝে একটা সরু যোগাযোগ থাকে। সেটা আরও সরু হতে হতে শেষপর্যন্ত ছিঁড়ে যায়। দুটো পৃথক কোষ হয়ে যায়। বারবার এই রকমের কোষ-বিভাগের ফলে ভ্রূণর বিকাশ ঘটে।

মানুষ আর অন্যান্য উচ্চতর জীবদেহে একরকম হল জননকোষ। মাতৃগর্ভে জননকোষ গিয়ে ভ্রূণর সূচনা হয়। গর্ভাধানের পর কোষ-বিভাগ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই ভ্রূণ থেকে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ জীবটি গড়ে ওঠে। এইভাবে বংশানুক্রমে বিভিন্ন প্রাণীর ধারা রক্ষিত হয়।

এতদূর অবধিও বিশেষ কোন মতভেদ নেই। তাছাড়া, যৌনসংগমের ফলে যে-বংশগতি, তার বাহক হল ঐ জননকোষ, তাতেও কোন মতভেদ নেই। যৌনসংগমের বেলায় জননকোষের নিউক্লিঅসের মাঝে ক্রোমোজোমই-যে বংশগতির বাহক,—তাতেও কোন মতভেদ নেই। কিন্তু, এইখান থেকেই মতভেদ সুরু হল।

মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা বলেন—

১) ক্রোমোজোম পদার্থর মাঝে থাকে সেই "বিশেষ বংশগত পদার্থ।" এবং সেই "বংশগত পদার্থই" বংশগতির একমাত্র বাহক।

২) "এই ক্রোমোজোম যেন নিজেই এক স্বতন্ত্র দুনিয়া।" সমগ্র জীবদেহটি, আর তার কোষগুলি হল "বংশগত পদার্থর" বাসভূমি মাত্র; তার পুষ্টির যোগানদার মাত্র। জীবদেহ ও তার অন্যান্য কোষ থেকে এই "বংশগত পদার্থ" তথা "জননকোষ উৎপন্ন হতে পারে না কখনও।"

৩) এই "বংশগত পদার্থ" অজর, অমর, অপরিবর্তনীয়। এই পদার্থই জীবদেহর সমগ্র বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

আর, সোবিয়েৎ মিচুরিন জীববিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে—

১ (ক) "বিশেষ বংশগত পদার্থ" বলে কিছু আদৌ নেই।

(খ) সরাসরি যৌনসংগমের বেলায় ক্রোমোজোমই বংশগতির বাহক বটে; কিন্তু, সরাসরি যৌনসংগমই বংশপরম্পরারক্ষার একমাত্র

প্রক্রিয়া নয়। কলমবাঁধা, অযৌন সংকর প্রক্রিয়া, ইত্যাদি থেকে দেখা গেছে—"যেকোন জীবন্ত পদার্থই, জীবদেহর যেকোন কণাই ক্রোমোজোমেরই মতো বংশগতির বাহক।"

২) "...জীব, এবং তার দেহই নতুন জীবদেহর জননকোষগুলি... উৎপাদন করে। যে-জননকোষ থেকে এই নতুন পরিণত জীবটি সৃষ্টি হল, সেই একই জননকোষ থেকে নতুন জীবটির জননকোষ সৃষ্টি হয় না।"

৩) বংশগতি চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। "হঠাৎ" ছাড়াও মানুষের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় বংশগতির পরিবর্তন ঘটতে পারে। "কোন জীবের বংশগতি গড়ে উঠবার পদ্ধতিটি একবার জানতে পারলে, আমরা উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি ক'রে তাকে নির্দিষ্ট দিকে পরিবর্তিত করতে পারি...।"

একেবারে হাতেকলমে—সোবিয়েৎ দেশের ক্ষেতখামারে, গোয়ালে নতুন জাতের ফল, শস্য, গরু-ভেড়া সৃষ্টি ক'রে—এর প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করা হয়েছে। সোবিয়েৎ বিজ্ঞান ঘোষণা করেছে—"আকস্মিকতা" হল বিজ্ঞানের নিকৃষ্ট শত্রু। তাই, সোবিয়েৎ বিজ্ঞানের রণধ্বনি হল: "প্রকৃতির আশীর্বাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকব না; তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়াই আমাদের কাজ।"

প্রাণের উৎপত্তি "রহস্য"

আমাদের 'চার পা থেকে দু' পা' হবার কাহিনীর বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় একবার প্রশ্ন এসে পড়েছে—"জীবন সৃষ্টি হল কী করে?" জীবন সৃষ্টির সেই বিরাট ইতিহাস আলোচনার মাঝে আমরা তখন যাইনি। এইবার কিছুটা চেষ্টা করা হবে। কিন্তু "চেষ্টা" মাত্র।

'চার পা থেকে দু'পা' হবার কাহিনীটি রচনা করা হয়েছে ফ্রেডরিক

এঙ্গেল্‌স-এর দেওয়া তত্ত্ব ও তথ্যর ভিত্তিতে। সেই এঙ্গেল্‌স প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা ক'রে গেছেন। আমাদের এই পৃথিবীটা একসময়ে ছিল ভীষণ উত্তপ্ত গলিত বস্তুরাশি। সে-তাপ ক্রমে ক'মে আসতে লাগল। এবং এক সময়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল। তখন অ্যালবুমেন অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থর সঙ্গে মিলে জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি হল।

এই প্রোটোপ্লাজম হল প্রোটিন। তার কোন সুনির্দিষ্ট আকৃতি নেই; সুনির্দিষ্ট গঠনপ্রণালীও নেই। কিন্তু, এই গুণগুলি তার হল: হজম ক্ষমতা, মলত্যাগ করা, গতি, সংকোচন, উত্তেজকে প্রতিক্রিয়া, ও জনন ক্ষমতা। এইগুলিই প্রাণের প্রধান মূল লক্ষণ। এঙ্গেল্‌স বলেছেন: "...হাজার হাজার বছর কেটে যাবার পর পরবর্তী অগ্রগতির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এই আকৃতিবিহীন প্রোটিন থেকে নিউক্লিঅস ও ঝিল্লীওয়ালা কোষ সৃষ্টি হয়েছিল।"

অর্থাৎ, নিম্নতর প্রাণযুক্ত পদার্থ থেকেই কোষ সৃষ্টি হল। সরাসরি নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে জৈব কোষ সৃষ্টি হয়নি। তার আগে কোষবিহীন প্রাণযুক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়েছিল। এবং তারই থেকে সৃষ্টি হল কোষযুক্ত জৈব পদার্থ।

শতাবধি বছর ধ'রে সোবিয়েৎ জীববিজ্ঞান তা হাতেকলমে প্রমাণ করেছে। মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীদের শেষ পরিখাটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। জার্মান বিজ্ঞানী ভিরচাও-এর প্রতিক্রিয়াশীল মত অনুযায়ী মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা বলেন যে, একমাত্র কোষ-বিভাগের ফলেই নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। কিন্তু, যে-কোষটি বিভক্ত হয়ে নতুন কোষটি এল, সেই মূল কোষটি এল কোথা থেকে? প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হল কী করে?

প্রাণ হল "শাশ্বত","বস্তুর অন্তর্নিহিত"—এইসব ব'লে মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা প্রশ্নটাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওসব ধর্মীয় বুলিতে কাজ হয় না। তাই, শুনতে একটু "বিজ্ঞান-বিজ্ঞান" মনে হয়, এমনি একটা কথাও তাঁরা

বললেন। বললেন : অজৈব নিষ্প্রাণ পদার্থের আকস্মিক যোগাযোগের ফলে প্রাণবন্ত জৈব কোষ সৃষ্টি হয়ে গেল। তাঁদের "বিজ্ঞান"ও সেই "হঠাৎ"-এর বেশি এগোতে পারল না। সেই-যে "হঠাৎ" হল আদি কোষ, তারপর থেকে হতে লাগল কোষ ভেঙে কোষ ; আবারও কোষ-বিভাগের ফলে আরও কোষ…। অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত সবই কেবল গাদাগাদা কোষ,—সেই "আদি কোষ" থেকে সব। নতুন কিছু নেই। নতুন কিছু হতে পারে না। এবং সেইখান থেকে সুরু করে মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা তাঁদের সমগ্র ব্যবস্থাটি গড়ে তুললেন। আর কারণ আছে। কারণ,—কোষ থেকেই নতুন কোষ হওয়া চাই। কোষেরও নিম্নতর স্তরের কোন প্রাণযুক্ত পদার্থ থেকে কোষ হলে তাঁদের বিপদ। তাঁদের অজর-অমর "বংশগত পদার্থ", "অপরিবর্তনীয় বংশগতি"-যে নাকচ হয়ে যায়। তাই, তাঁরা ভিরচাও-এর মতবাদটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে রইলেন।

তাঁরা বললেন : "কোষ থেকেই অন্য কোষ গড়ে ওঠে", "কোষের বাইরে জীবন্ত কিছু নেই", "কোষই জীবনের মূল ইউনিট", "জীবদেহ হল কোষের সমষ্টি মাত্র—যেন একটি কোষ-রাষ্ট্র", ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব কথা সত্য হলে কী হয়? নতুন জাতের শস্য, কিংবা জীবজন্তু সৃষ্টি করা যায় না। তা সৃষ্টি করবার কথাটিও ভাবা যায় না। নির্ভর করে থাকতে হয় প্রকৃতির খেয়ালখুশিরই ওপর।

কোষ থেকে অন্য কোষ সৃষ্টি হয় ঠিকই। আমরা আগেই বলে এসেছি, কোষ-বিভাগই জৈব বিকাশের **প্রধান** ভিত্তি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, তাই-ই একমাত্র প্রক্রিয়া নয়। এবং কোষ-বিভাগটাও ঐ মেণ্ডেল-মর্গ্যান-বাদীদের ফতোয়া অনুযায়ী হয় না। কোষের বাইরেও প্রাণযুক্ত পদার্থ আছে। তার থেকে সম্পূর্ণ নতুন গুণবিশিষ্ট কোষ উৎপন্ন হয়। নইলে, বিজ্ঞানের কোন প্রগতিই সম্ভব হত না। প্রকৃতিতেও, তা ঐভাবে ঘটে। মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা তাকে "হঠাৎ" বলে বাতিল করে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সোবিয়েৎ বিজ্ঞান সে-বাধা মানেনি।

ভিরচাও-এর মতবাদ শতাবধি বছর ধরে কোষ-বিজ্ঞানে রাজত্ব করে এসেছে। কোষের বিকাশ সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান-গবেষণা করা হয়নি। করতে তাঁরা দেননি। নতুন গুণসম্পন্ন দেহবস্তু হয় নাকি? কী করে হয়? তা তাঁরা অনুসন্ধান করতে দেননি। কোষের বাইরেও কোন জৈব পদার্থ? মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীদের অভিধানে অমন কোন কথাই নেই। এখনও নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে কোষবিহীন সেই নিম্নতর ধরনের প্রাণযুক্ত পদার্থ উৎপাদন করা যায় কিনা, সে-প্রশ্নও তাঁদের কাছে অবান্তর।

বিশ্ববিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ঈভান পি. পাভ্‌লভ প্রমাণ করলেন যে, জীব-দেহটি কতকগুলি কোষের সমষ্টিমাত্র নয়! এবং কোষগুলিও প্রত্যেকে স্বয়ং-স্বতন্ত্র নয়। জীবদেহ হল একটি সমগ্র ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু, অধ্যাপিকা ওল্‌গা বোরিসোভ্‌না লেপেশিন্‌স্কাইয়াই শেষপর্যন্ত হাতেকলমে প্রমাণ করে দিলেন যে, কোষের বাইরেকার জৈব পদার্থ থেকেও নতুন কোষ সৃষ্টি হয়,— শুধু কোষ থেকেই নয়।

পরিমাণ ও গুণ

লেপেশিন্‌স্কাইয়া গবেষণা চালালেন মাছ, ব্যাঙ, সরিসৃপ, পাখি, এইসব নিয়ে। তাদের জৈব বিকাশের প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা করতে লাগলেন। চূড়ান্ত প্রমাণ পেলেন মুরগীর ডিমে। আমাদের দেশে, এবং সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় মুরগীর ডিম সম্পর্কে কী বলা হয়? প্রাথমিক বিজ্ঞান পাঠ থেকে উচ্চতম পাঠ্য পুস্তক পর্যন্ত সেই একই কথা: ডিমের কুসুমটা হল প্রাণহীন পদার্থ। কোষের নিউক্লিঅসটি থাকে প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর মাঝে। সেই প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর বিভাগের ফলেই ভ্রূণর বিকাশ ঘটে। ডিমের কুসুমটা হল সেই ভবিষ্যৎ ভ্রূণর পুষ্টির যোগানদার মাত্র। আর কিছু নয়। অর্থাৎ, যান্ত্রিক বিভাগ চলেছে; আর পরিমাণগত বৃদ্ধিই জীবদেহে বিকাশের মোট ব্যাপারটা। গাদাগাদা হয়ে বেড়ে উঠলেই হল। এই আমাদের শেখানো হয়। লেপে-শিন্‌স্কাইয়া দেখালেন, ওই কুসুমটা পুষ্টিমাত্র নয়। আরও কিছু। প্রাণবস্তু

পদার্থ। তার থেকেও কোষ সৃষ্টি হয়। বিশেষ ধরনের যন্ত্র তৈরি করে তিনি তা দেখলেন। ডিমের কুসুমের মাঝে গুঁড়িগুঁড়ি কুসুম-গুলিকা থাকে। সেগুলি হল মূলতঃ অ্যালবুমেন-কণা। কুসুম-গুলিকাগুলি প্রথমে দানাদার হয়ে ওঠে। তারপর ধীরে ধীরে নিউক্লিঅস দেখা দেয়। এবং শেষপর্যন্ত গড়ে ওঠে রীতিমতো কোষ। অন্য যেকোন কোষের মতো বিভক্ত হয়ে সেই কোষও ভ্রূণের বিকাশে অংশ গ্রহণ করে। এমনি আরও বহু পরীক্ষার মাঝে লেপেশিন্‌স্কাইয়া দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কোষের বাইরেকার জৈব পদার্থ থেকেও নতুন কোষ গড়ে ওঠে।

কেবল তাই নয়। কোষ-বিভাগ প্রক্রিয়াটিকেও দেখতে হবে বুঝতে হবে এই নতুন আলো ফেলে। ভিরচাও-এর মত অনুযায়ী মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীরা কী বলেন?—তাঁরা বলেন: সোজা কথা, একটা ভাগ হয়ে দুটো, দুটো ভাগ হয়ে চারটে…। সংখ্যা বাড়ছে, পরিমাণ বাড়ছে। পরিবর্তনটা শুধু পরিমাণগত! কিন্তু আসলে তা নয়। শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি, আর পরিমাণবৃদ্ধিই নয়। গুণগত পরিবর্তনও ঘটে সঙ্গে সঙ্গে। একটা নতুন কোষ সৃষ্টি হয় পুরানর মাঝে। একই জীবদেহে-যে বহু রকমের বহু গুণের কোষ থাকে, তা আসে কোথা থেকে? যদি পরিবর্তনটা কেবল পরিমাণগতই হবে, তাহলে নতুন গুণের কোষ আসে কী করে? তার জবাব এই। মূল কোষটির মাঝে যে-সাধারণ প্রাণবন্ত পদার্থ থাকে, তারই থেকে সৃষ্টি হয় নতুন কোষ।

লেপেশিন্‌স্কাইয়ার এই আবিষ্কার সোবিয়েতের মিচুরিন জীববিজ্ঞানের ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। কোন জীবদেহর প্রতিবেশ যখন বদলানো হয়; তার জীবনের অবস্থাটাই যখন বদলে দেওয়া হয়, তখন সে বাধ্য হয়েই সেই নতুন প্রতিবেশে নতুন পদার্থ থেকে নিজের দেহ গড়ে তোলে। অবশ্য, প্রতিবেশও এমনভাবে বদলানো হয়, যাতে জীবদেহর প্রয়োজনীয় পদার্থ তাতে থাকে; যাতে প্রয়োজনমতো দিকে পরিবর্তন ঘটবার মতো মালমশলা সেখানে থাকে।

এইভাবে সোবিয়েৎ জীববিজ্ঞান এক বিরাট "রহস্য" ঘুচিয়ে দিতে চলেছে প্রাণের উৎপত্তি ছিল অন্ধকারে ঢাকা। সে-অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছিল মেণ্ডেল-মর্গ্যানবাদীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। "অসম্ভববাদে"র বেড়া দিয়ে তারা ঘিরে রেখেছিল প্রাণের উৎসটিকে। কিন্তু সোবিয়েতের সন্ধানী দৃষ্টি আর নতুন জীববিজ্ঞানের আলো তাকে খুঁজে পেয়েছে, উদ্‌ভাসিত করে তুলেছে। প্রাণের উৎপত্তি জীবদেহর মাঝেই কেবল নয়। তা ঘটছে বাইরেও। কোষের থেকে কম সংগঠিত জীবন্ত পদার্থ থেকে নতুন কোষ গড়ে উঠছে। আবার, নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকেই গড়ে উঠছে সেই কম-সংগঠিত জীবন্ত পদার্থ।

একদিকে সোবিয়েৎ মিচুরিন জীববিজ্ঞান। অন্যদিকে—পুঁজীবাদী দুনিয়ার অপবিজ্ঞান। একদিকে যুদ্ধপ্রস্তুতিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা দিয়ে। অন্যদিকে—প্রাণের উৎস, সৃষ্টির "রহস্যপুরী" জয় করা হচ্ছে। জাপানী "বিজ্ঞানীরা" এক সময়ে মারাত্মক সব জীবাণু আবিষ্কার করে কোটি কোটি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করবার চক্রান্ত এঁটেছিল। আজ মার্কিন যুদ্ধবাদীরা তাদের আশ্রয় দিয়েছে। জীবাণুযুদ্ধে, অ্যাটমবোমার যুদ্ধে, ট্রুম্যানের নতুন নতুন "অবাক-অস্ত্র" সাহায্যে সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস করবার হুঙ্কার ছাড়ছে। আর, সোবিয়েৎ দেশে তারা বিজ্ঞান দিয়ে শস্যর শীষ একটার জায়গায় দুটো করতে লেগেছে। মাটির প্রকৃতি বদলে তারা ফসলের প্রাচুর্য সৃষ্টি করছে। মরুভূমিকে করে তুলছে সুজলা-শস্যশ্যামলা। সোবিয়েতের নতুন ব্যবস্থায় নতুন মানুষের নতুন বিজ্ঞান তা সম্ভব করেছে।